ভাষান্তরে বুদ্ধভাবনা

জয়দেব কর

এ-গ্রন্থখানিতে স্থান পাওয়া লিখাগুলো আমি বিশ্ববিখ্যাত চারজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের চারটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে নিয়েছি। গ্রন্থগুলো হলো: ওয়ালপোলা রাহুলের *What the Buddha Taught*, বুদ্ধদাস ভিক্ষুর *Keys to Natural Truth*, ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের *The Buddha and His Dhamma* এবং ভিক্ষুণী ধম্মানন্দার *Women in Buddhism (Questions and Answers)*।

প্রচ্ছদ : চারু অর্পিতা

জয়দেব কর

জন্ম

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

শ্রীকরপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ

মা

গীতা রানী কর

বাবা

মনিন্দ্র কুমার কর

প্রকাশিত গ্রন্থ

আমি জন্মান্ধ হোমার (কবিতা, ২০০৯)

অস্ত্রাগার হয়ে যাক জাদুঘর (কবিতা, ২০১৭)

আলোকচিত্র : চন্দন রিমু

ভাষান্তরে বুদ্ধভাবনা

জয়দেব কর

নাগরী

নাগরী

ভাষান্তরে বুদ্ধভাবনা

জয়দেব কর

স্বত্ব : অনুবাদক

প্র কা শ ক

নাগরী

বাবুতখানা, সিলেট-৩১০০, বাংলাদেশ

প্র থ ম প্র কা শ

বৈশাখ ১৪২৪

এপ্রিল ২০১৭

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : চারু অর্পিতা

মূল্য : ১৮০ টাকা

অনলাইন পরিবেশক : রকমারি ডটকম

Bhashantare Buddha Bhabana by Jaydeb Kar

Published by NAGREE. Barutkhana, Sylhet-3100, Bangladesh

01714 610061, 01712 082967, nagree14@gmail.com

Price: ৳ 180 $ 10 £ 15 Rs180

ISBN: 978-984-92401-8-1

উৎসর্গ

বন্ধুদ্বয়

চন্দন রিমু

ও

সুদীপ দাস

ভূ মি কা

ক.

'আত্মশরণ অনন্য শরণ', 'নিজেই নিজের প্রভু, নিজেই নিজের ত্রাতা' — বাক্যদ্বয় মানুষের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে, মানুষকে কারও খেলার পুতুলের ভ্রান্ত ভূমিকা থেকে সরিয়ে নিয়ে, সর্বাবস্থায় মানুষরূপে কর্তার ভূমিকায় বসায়। সবাই মানুষকে নিয়ে কথা বলেছেন, বলছেন, কিন্তু, মানুষের এমন সম্ভাবনাকে স্বীকার করে কয়জন মানবসন্তান কথা বলেছেন?

সবাই ডেকেছেন — বলেছেন — 'এসো, আমারটা গ্রহণ করো, আমার শরণ নাও, আমারটা শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি এক এবং অদ্বিতীয়, অমুক আমার প্রতিনিধি', 'সকল ধর্ম-কর্ম ছেড়ে কেবল আমার শরণ নিলে আমি তোমাকে সব পাপ হতে মুক্ত করব'। 'এসো, দেখো, পর্যবেক্ষণ করো, আত্মপরের মঙ্গল থাকলে তা গ্রহণ করো, নাহয় বর্জন করো' অথবা 'আমার শিক্ষা ভেলায় ন্যায়, পারের সহায়ক, মাথায় করে বহন করার জন্য নয়' — এমন আহ্বান কয়জন মানবসন্তান করছেন ও করেছেন?

উপরে আমার প্রশ্ন দুটোতে আশা করি কেউ বিরক্ত হবেন না। প্রশ্নগুলোর উত্তর এখানে জরুরি নয়। বরং এখানে যে বোধকে অবলম্বন করে প্রশ্ন করলাম সেই বোধকে উপলব্ধি করার অথবা সেই বোধে একাত্ম হওয়ার একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে কি না তা বিবেচনা জরুরি।

যিনি তাঁর শিক্ষাকে, উপরের দুটি প্রশ্নের 'কয়জন মানবসন্তান?'-প্রশ্নের উত্তরের অন্যতম একজন ও প্রথমজন হয়ে মানুষের মুক্তির শিক্ষা (ধম্ম) প্রচার করেগেছেন সারা জীবন, তিনি মানবপুত্র গৌতম (খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩- খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩)। তিনি যুক্তি (প্রজ্ঞা) আর প্রেমের (করুণা) সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সাম্যবাদী অখণ্ড মানবসমাজ নির্মাণের জন্য কাজ করেগেছেন অবিচলিতভাবে। বিচলিত না-হয়ে কর্ম ও জীবনযাপন করার মহামূল্য এক সঞ্জীবনী শক্তি দান করেগেছেন জিজ্ঞাসুর অন্তরে

যা সর্বমানবের জন্য মুক্তির মহামন্ত্র—'শোনা কথায় বিশ্বাস কোরো না। বংশ-পরম্পরায় প্রচলিত বলে বিশ্বাস কোরো না। সর্বসাধারণ এটা বলছে বলে বিশ্বাস কোরো না। ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে বলে বিশ্বাস কোরো না। গুরুজন বা বয়োজ্যেষ্ঠরা বলেছেন বলে বিশ্বাস কোরো না। কারো ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভূত হয়ে বিশ্বাস কোরো না। তর্কের চাতুর্যে বিশ্বাস কোরো না। নিজের মতের সঙ্গে মিল আছে বলে বিশ্বাস কোরো না। দেখতে সত্য বলে মনে হলেই বিশ্বাস কোরো না। নিজের শিক্ষক বলেছেন বলেই বিশ্বাস কোরো না। নিজের বিচার-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে যদি দেখতে পাও—এগুলো যুক্তির সঙ্গে মিলে এবং নিজের ও সকলের জন্য মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর,—তাহলে তা গ্রহণ করবে এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করবে।'

তিনি জীবন ও জগৎকে ব্যাখ্যা করার জন্য অলৌকিকতার আশ্রয় নেননি, আশ্রয় নেননি কোনও চরম অন্তের, তাঁর আশ্রয় ছিল কার্যকারণ-নির্ভর মধ্যম পথ। তাই তাঁর চিন্তাপদ্ধতি অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। অন্যরা যেখানে 'ঈশ্বর-পরকালতত্ত্ব' অথবা 'যতদিন বাঁচো, সুখে বাঁচো, ঋণ করে হলেও ঘি খাও'—এসবকিছু অবলম্বন করে, মানুষের সঙ্কট এড়িয়ে গিয়ে, মূলত মানুষকে তাদের চিন্তার দাস করে রাখতে চেয়েছে, সেখানে তিনি দেখিয়েছেন কার্যকারণের ভেলায় মানুষের মুক্তি ইহলৌকিক ও উপলব্ধিযোগ্য এবং মানুষ কারও চিন্তাদাস নয়, এমনকী তাঁরও। কার্যকারণ-আশ্রিত তাঁর যুক্তি (প্রজ্ঞা) ও প্রেমের (করুণা) শিক্ষা (ধম্ম) অকুশলকে (অমঙ্গল) অকরণীয় বলে।

পরকাল-নির্ভর বা ঈশ্বরনির্ভর তত্ত্বগুলো কার্যকারণের ধার ধারে না। সেগুলোর অবলম্বন হচ্ছে লোভ-ভয়-মোহ। পুরস্কারের লোভ, শাস্তির ভয়, শান্তির মোহ—এই তিন মিথ্যাভাবনায় ডুবিয়ে রাখতে চায়। শাস্তির ধারণার জন্য পাপের ধারণা, পুরস্কারের জন্য পুণ্যের ধারণা। কিন্তু, বুদ্ধের শিক্ষা পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে উঠে নির্লোভতা, নির্ভয়তা, নির্মোহতা নিজের মধ্যে অনুশীলন করে মানুষ কীভাবে আলোকোজ্জ্বল মঙ্গলপ্রদীপের ন্যায় উদ্ভাসিত হতে পারে সে সাহস ও পথ বাতলে দেয়।

তিনি চেতনাকেই কর্ম বলেছিলেন। তাঁর শিক্ষা সুপ্ত অথবা প্রকাশিত শুভ চেতনা বা মঙ্গলকর চেতনার পরিচর্যা করার পথ দেখিয়ে দেয়। উৎপন্ন 'অশুভ'-কে নির্মূল করা ও অনুৎপন্ন 'অশুভ'-এর জন্মসম্ভাবনা চিরতরে বন্ধ করার শুভ ঠিকানার দিকে নিয়ে যায় ধীরে ধীরে।

তাঁর অনাত্মের তত্ত্ব দেখিয়ে দেয় নিজের মধ্যে অজস্র 'আমি'-এর উদয়-বিলয় কীভাবে সংঘটিত হচ্ছে অবিরাম। চোখকে আশ্রয় করে, কানকে আশ্রয় করে, নাককে আশ্রয় করে, জিহ্বাকে আশ্রয় করে, ত্বককে আশ্রয় করে 'আমি' জন্ম নেয়। দেহাশ্রিত অজস্র 'আমি'—সকলেই ভিন্নভিন্ন। দেহাতিরিক্ত কোনও শাশ্বত 'আমি'-এর সন্ধান নিজের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। দেহের অবসান হলে দেহাশ্রিত চেতনার বিনাশ ঘটে। যা-কিছু জন্ম নেয় তা ধ্বংসের অধীন। নিবিড়ভাবে অনাত্মের শিক্ষা নিজের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করলে লোভ-ভয়-মোহ দূর করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। লোভ-ভয়-মোহ-আশ্রিত অচিন্ত্য পরকাল-ঈশ্বর এবং উচ্ছেদবাদের এইসব যুগপৎ মিথ্যাদৃষ্টি মানুষকে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কার্যকারণের অভাব যেখানে থাকে সেখানে স্বচ্ছদৃষ্টি খুঁজে পাওয়ার কথা না। স্বচ্ছদৃষ্টি ছাড়া সমস্যা, সমস্যার কারণ, সমস্যার উচ্ছেদ, সমস্যা উচ্ছেদের পথ উন্মোচিত হয় না। স্বচ্ছদৃষ্টির অধিকারী হওয়া মানে নিজের মধ্যে লোভ-ভয়-মোহহীনতার শরণ, যাকে বলে আত্মশরণ, তা গ্রহণ করে জীবনপথে চলার জন্য মঙ্গলচৈতন্যের অধিকারী হওয়া। যেখানে লোভ-ভয়-মোহ নেই সেখানে প্রমত্ততা নেই। প্রমত্ততা মানুষকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে, অপ্রমত্ততা করে লক্ষ্যজয়ী। তাই তথাগত জীবনের শেষ বাক্যটিতেও তাঁর সমস্ত শিক্ষার সারাংশ হিসেবে সকল মানুষের প্রতি জীবনের সর্বশেষ শিক্ষাটি উপহার হিসেবে দিয়ে যান এভাবে—'ধ্বংসই সকল মিশ্র পদার্থের ধর্ম, অপ্রমাদের সঙ্গে নিজের মুক্তির পথ পরিষ্কৃত করো।'

খ.

বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের সঙ্গে বর্ণপ্রথা তথা ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী বুদ্ধ ও বুদ্ধের শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। চর্যাপদ থেকে শুরু করে আজকের দিনের বাঙালি লোক ও আধুনিক শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যজুড়ে বুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব অপরিসীম। বাঙালির বুদ্ধ-চর্চার ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রায় চারশ বছরের পালযুগের বৌদ্ধ বাংলা বুদ্ধশিক্ষা ও প্রগতিশীলতার এক প্রতিনিধিত্বশীল ভূখণ্ডের নাম। অতীশ দীপঙ্কর, শীলভদ্রসহ চৌরাশী সিদ্ধা বলে পরিচিত অন্যান্য পণ্ডিত বাংলার সীমা ছাড়িয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিব্বত নেপালসহ গোটা প্রাচ্যের শুভ অগ্রগতির নেতা ও লোকশিক্ষক হয়ে। পাল-আমলে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিঃসন্দেহে বাঙালি মননে বুদ্ধ-চর্চার চূড়ান্ত বিকাশের ফল। কিন্তু এ ঊর্ধ্বমুখি বিকাশও একসময় পতনমুখী হয়ে ওঠে। বহিরাগত সেন রাজাদের হাতে পালশাসনের অবসান ঘটলে, তাদের রাজত্বের একশ বছরে সিংহভাগ বৌদ্ধদের ব্রাহ্মণ্যবাদের রোষানলে পড়ার মধ্য দিয়ে পতনের সূত্রপাত

ঘটে। পাশাপাশি নিজেদের মধ্যকার বাড়ন্ত অবক্ষয় তাদের অন্তসারশূন্য করে তোলে। ভিক্ষুরা শিক্ষকের ভূমিকা ছেড়ে হয়ে উঠতে থাকেন পুরোহিত। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শ্রীহীন হতে থাকে সঙ্ঘারাম তথা বিদ্যাপীঠগুলো। বহিরাগত তুর্কি দখলদারদের দ্বারা সেন-শাসনের পতন ঘটলে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আঘাতটি আসে। সঙ্ঘারামগুলো হয়ে ওঠে ধ্বংসস্তূপ, নির্বিচারে মুণ্ড খসতে থাকে ভিক্ষুদের। কেউ কেউ শাস্ত্র-গ্রন্থসহ পালিয়ে যেতে সক্ষম হন নেপাল-তিব্বতে। সম্ভবত পালিয়ে যাওয়া ভিক্ষুদের হাত দিয়েই বাংলা ভাষার আদি-নিদর্শন চর্যাপদ নেপালে পৌঁছেছিল। ধর্মগুরুবিহীন সাধারণ বৌদ্ধরা ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলিম হিসেবে ধর্মান্তরিত হতে থাকেন, আর স্বল্পসংখ্যক টিকে থাকেন পৈতৃক ধর্মে—সেই সময়ের দুর্গম অঞ্চলগুলোতে। তবে সিংহভাগই সুফিদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু তারা যে পূর্বেকার চিন্তা চিরতরে পরিত্যাগ করেননি, তার প্রমাণ হিসেবে আজও টিকে আছে বাউলধারাটি, যাতে অধিকাংশ বাঙালির রয়েছে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ভালোবাসা।

গ.

ভাষান্তরে বুদ্ধভাবনা গ্রন্থটি আমার মৌলিক কোনও সৃষ্টি নয়। আমার পাঠ-করা কিছু প্রিয় বুদ্ধভাবনার বাংলারূপ দেওয়ার একটা সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র। আমার কাছে মনে হয়েছে, এই প্রিয় পাঠগুলোর সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা কর্তব্য। বুদ্ধকে নিয়ে বাংলা ভাষায় অনেক অনেক চমৎকার গ্রন্থাবলি রয়েছে। সেই সমস্ত গ্রন্থের সঙ্গে আমার সামান্য ইংরেজি বিদ্যার সহায় নিয়ে সৃষ্টি এই অনুবাদগ্রন্থটি কতোটুকু সহাবস্থান করতে পারবে বা পারবে না, তা বিচার করে দেখার আহ্বান করার ধৃষ্টতা আমার নেই। পাঠকের যুক্তিবাদী মন অবশ্যই গ্রহণ-বর্জনের অধিকার রাখে।

এ গ্রন্থখানিতে স্থান পাওয়া লেখাগুলো আমি বিশ্ববিখ্যাত চারজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের চারটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে নিয়েছি। গ্রন্থগুলো হলো : ওয়ালপোলা রাহুলের *What the Buddha Taught*, বুদ্ধদাস ভিক্ষুর *Keys to Natural Truth*, ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের *The Buddha and His Dhamma* এবং ভিক্ষুণী ধম্মানন্দার *Women in Buddhism (Questions and Answers)*।

পরিশেষে পাঠক-প্রকাশকসহ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাই। সবার মঙ্গল হোক।

জয়দেব কর

joydeb01721@gmail.com

সূ চি প ত্র

ওয়ালপোলা রাহুল (১১-৫৬)

মনের বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি • ১১

চতুর্থ মহাসত্য : মগ্‌গ : পথ • ২৭

ধ্যান বা মানসিক কর্ষণ : ভাবনা • ৩৩

বুদ্ধের শিক্ষা ও আজকের বিশ্ব • ৪৩

বুদ্ধদাস ভিক্ষু (৫৭-৬৬)

সাহায্য করো! কালাম-সুত্ত সাহায্য করো! • ৫৭

ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (৬৭-৬৮)

অহিংসা • ৬৭

ধম্মানন্দা ভিক্ষুণী (৬৯-৭৬)

বুদ্ধমতবাদে নারী (প্রশ্নোত্তরসমূহ) • ৬৯

লেখক পরিচিতি • ৭৭

ওয়ালপোলা রাহুল

মনের বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি

ধর্ম-প্রবর্তকদের মধ্যে বুদ্ধ (যদি আমাদের জনপ্রিয় ধারণায় তাঁকে ধর্মের প্রবর্তক বলতে বলা হয়) ছিলেন একমাত্র শিক্ষক যিনি নিজেকে একজন খাঁটি ও সরল মানুষের বাইরে আর কিছু হিসেবে দাবি করেননি। অন্যান্য ধর্মগুরু বা প্রবর্তক ছিলেন—ঈশ্বর, অথবা তার অবতার না হয় তার দ্বারা অনুপ্রাণিত। বুদ্ধ শুধুই একজন মানবসত্তা ছিলেন না; তিনি কোনও ঈশ্বর অথবা বাইরের কোনও শক্তির অনুপ্রেরণাহীনতাও দাবি করেছিলেন। তাঁর সকল বোধ, সিদ্ধি ও অর্জন তিনি মনুষ্যপ্রচেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তায় আরোপ করেছিলেন। একজন মানুষ, শুধু একজন মানুষই, বুদ্ধ হতে পারে। একজন মানুষের ভিতর বুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যদি সে তা চায় এবং প্রচেষ্টা করে। আমরা বুদ্ধকে উৎকৃষ্ট মানুষ হিসেবে ডাকতে পারি। তিনি তাঁর মানবীয়তায় এতটা নিখুঁত ছিলেন যে, পরবর্তীকালে জনপ্রিয় ধর্মে প্রায় অতিমানব হিসেবে পূজিত হয়ে এসেছেন।

বুদ্ধমতবাদ অনুযায়ী মানুষের অবস্থান হচ্ছে সর্বোচ্চ। মানুষ নিজেই নিজের প্রভু, এবং তার গন্তব্য বা তার পরিণতির বিচারের জন্য উচ্চতর কোনও সত্তা অথবা শক্তি নেই।

বুদ্ধ বলেছিলেন, নিজেই নিজের আশ্রয়, নিজে ব্যতীত অন্য কে আশ্রয় হতে পারে?[১] তিনি তাঁর শিষ্যদের সতর্ক করেছিলেন 'তাদেরকে তাদের আশ্রয় হতে' এবং অন্যকারও কাছে কখনও আশ্রয় অথবা সাহায্য খোঁজ না করতে।[২] মানুষের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সকল প্রকার বন্দিত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করার ক্ষমতা আছে বলে প্রত্যেক মানুষকে নিজেকে উন্নত করতে এবং আত্মমুক্তির জন্য কাজ করতে তিনি শিক্ষা, সাহস ও উদ্দীপনা দিয়েছিলেন। বুদ্ধ বলেন—

---

১. ধর্মপদ XXII4.

২. দীঘ-নিকায় II(কলম্বো,১৯২৯), পৃ. ৬২ (মহাপরিনিব্বান-সুত্ত)।

আপনাদের নিজেদের কাজ করা উচিত। কারণ তথাগত[৩] শুধু পথের শিক্ষা দেন।[৪] বুদ্ধ নির্বাণ বা মুক্তির পথ আবিষ্কার করেছিলেন এবং তা দেখিয়েছিলেন বলে তাঁকে পরিত্রাণকর্তা ডাকা যায়। কিন্তু আমাদের অবশ্যই নিজেদের পথের দিকে হাঁটতে হবে।

এই ব্যক্তিগত দায়িত্বপরায়ণতার নীতির ওপর বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের স্বাধীনতা অনুমোদন করেছিলেন। মহাপরিনিব্বান-সুত্তে বুদ্ধ বলেছেন যে, তিনি কখনওই সঙ্ঘ[৫] (সন্ন্যাসীদের সংগঠন) নিয়ন্ত্রণের কল্পনা করেননি, সঙ্ঘ তাঁর ওপর নির্ভরশীল হোক তাও তিনি চাননি। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর শিক্ষায় কোনও গোপন তত্ত্ব নেই। 'শিক্ষকের হাতের মুঠোতে' (আচরিয়া মুট্‌ঠি) কিছুই লুকানো নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় 'তাঁর আস্তিনের ভিতর' কোনওকালে কিছুই লুকানো ছিল না।[৬]

ধর্মগুলোর ইতিহাসে, অন্যখানে, বুদ্ধ অনুমোদিত চিন্তার মুক্তি অশ্রুত। এই মুক্তি প্রয়োজনীয়, কারণ বুদ্ধের মতে, মানুষের মুক্তি নির্ভর করে তার নিজস্ব সত্য উপলব্ধির ওপর; কোনও ঈশ্বরের দয়ার দানে অথবা কোনও বাহ্যিক শক্তির প্রতি অনুগত ভালো ব্যবহারের পারিতোষিক প্রাপ্তিতে নয়।

বুদ্ধ একবার কোশল রাজ্যের কেসাপুত্তায় গিয়েছিলেন। এই শহরের অধিবাসীরা কালাম নামে পরিচিত। যখন তারা শুনলেন বুদ্ধ তাদের শহরে আছেন, কালামরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে বলেন—

'মহোদয়, কিছু সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ আছেন যারা কেসাপুত্তায় আসেন। তারা শুধু তাদের নিজস্ব মতবাদ ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন করেন এবং অন্যদের মতবাদ তাচ্ছিল্য করেন, দোষযুক্ত করেন এবং অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর অন্যান্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যারা আসেন এবং তারাও তাদের বেলায় শুধু তাদের নিজস্ব মতবাদ ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন করেন, এবং অন্যদের মতবাদ তাচ্ছিল্য করেন, দোষযুক্ত করেন, এবং অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু মহোদয়, শ্রদ্ধেয় শ্রমণ-

---

৩. তথাগত মানে যিনি সত্যে উপনীত হয়েছেন যিনি সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। এ অভিধাটি বুদ্ধ নিজেকে এবং সাধারণভাবে বুদ্ধগণকে বোঝাতে ব্যবহার করতেন।

৪. ধর্মপদ XX4.

৫. সঙ্ঘ মানে 'সম্প্রদায়। কিন্তু বুদ্ধমতবাদে এই শব্দ দিয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সম্প্রদায় বোঝায় যা সন্ন্যাসীদের সংগঠন । বুদ্ধ, ধম্ম (শিক্ষা) ও সঙ্ঘ (সংগঠন) হচ্ছে তিশরণ 'তিনটি আশ্রয়' অথবা তিরতন (সংস্কৃতে ত্রিরত্ন)।

৬. দীঘ-নিকায় II (কলম্বো, ১৯২৯), পৃ. ৬২

ব্রাহ্মণদের মধ্যে আমাদের প্রতি কারা সত্যভাষণ এবং কারা মিথ্যাভাষণ করেন সে ব্যাপারে আমাদের সব সময় সন্দেহ ও দ্বিধা আছে।'

তারপর বুদ্ধ তাদের উদ্দেশে ধর্মের ইতিহাসের অনন্য এই উপদেশ প্রদান করেছিলেন—

'হ্যাঁ, কালামগণ,আপনাদের সন্দেহ থাকাটা যথাযথ, আপনাদের দ্বিধা থাকাটা যথাযথ, কারণ একটা সন্দেহ উদয় হয়েছে সেই বিষয়ে যেটি সন্দেহপূর্ণ। এখন কালামগণ শুনুন, গুজব দ্বারা অথবা প্রথা দ্বারা অথবা শ্রুতি দ্বারা পরিচালিত হবেন না। ধর্মগ্রন্থ দ্বারা অথবা কাল্পনিক যুক্তি বা অনুমান দ্বারা অথবা ভাবমূর্তি বিবেচনা করে, আনুমানিক সিদ্ধান্তে উল্লসিত হয়ে অথবা আপাতদৃশ্যমান সম্ভাব্যতাসমূহ দ্বারা অথবা 'এই আমাদের শিক্ষক' : ধারণায় নিয়ে পরিচালিত হবেন না। কিন্তু হে কালামগণ যখন আপনারা আপনাদের জন্য যে-সমস্ত বিষয় অমঙ্গলজনক (অকুশল), ভুল, মন্দ জানবেন তখন সেগুলো পরিত্যাগ করে ফেলুন। এবং যখন আপনারা আপনাদের জন্য যে-সমস্ত বিষয় মঙ্গলজনক (কুশল) ও ভালো জানবেন তখন সে-সমস্ত বিষয় গ্রহণ করুন এবং সেগুলো অনুসরণ করুন।'[৭]

এমনকী বুদ্ধ আরও গভীরে গিয়েছিলেন। তিনি ভিক্ষুদের উদ্দেশে বলেছিলেন যে, একজন শিষ্যের স্বয়ং তথাগতকে পরীক্ষা করা উচিত, তার ফলে তিনি (শিষ্য) যাঁকে অনুসরণ করেছেন সেই শিক্ষকের যথার্থ মূল্যায়ন করতে যুক্তিসংগতভাবে দৃঢ় হবেন।[৮]

বুদ্ধের শিক্ষা অনুযায়ী সত্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণালাভে এবং পারমার্থিক উন্নতির পথে (অথবা যেকোনও প্রগতির ক্ষেত্রে) পাঁচটি অন্তরায়ের[৯] (নীবরণ) একটি হচ্ছে সন্দেহ (বিচিকিচ্ছা)। সন্দেহ, যাই হোক, একটা পাপ না; কারণ বুদ্ধমতবাদে বিশ্বাসের কোনও স্থান নেই। অজ্ঞতা (অবিজ্জা) এবং ভুল দৃষ্টিভঙ্গি (মিচ্ছা-দিট্‌ঠি) হচ্ছে সমস্ত অকল্যাণের উৎস। এটা অনস্বীকার্য যে, পরিষ্কারভাবে না-বোঝা অথবা না-দেখা পর্যন্ত অবশ্যই সন্দেহ থাকবে। কিন্তু গভীরভাবে অগ্রসর হতে হলে অবশ্যই সন্দেহমুক্ত হতে হবে। সন্দেহ থেকে মুক্তি পেতে হলে যে কাউকে পরিষ্কার বুঝতে হবে।

---

৭. অঙ্গুত্তর-নিকায় (কলম্বো ১৯২৯), পৃ. ১১৫

৮. বিমাংসাক-সুত্ত,ন. ৪৭ মজ্ঝিম-নিকায়।

৯. পঞ্চ-অন্তরায়গুলো হচ্ছে : (১) ইন্দ্রিয়জাত কামনা-বাসনা (২) অশুভ ইচ্ছা (৩)শারীরিক ও মানাসিক অবসাদ এবং আলস্য (৪) অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা (৫) সন্দেহ।

এমনটি বলার সুযোগ নেই যে, কারও সন্দেহ করা অনুচিত অথবা কারও বিশ্বাস করা উচিত। 'আমি বিশ্বাস করি' বললে বোঝায় না যে আপনি তা বুঝেছেন এবং দেখেছেন। যখন একজন ছাত্র কোনও একটা গাণিতিক সমস্যা সমাধানে কাজ করে, সে একটা পর্যায়ের কাছে আসে, যা সে জানে না কীভাবে অগ্রসর হতে হয় এবং সেখানে সন্দেহ ও দ্বিধায় থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার এই সন্দেহ থাকবে, সে অগ্রসর হতে পারবে না। যদি সে এগিয়ে যেতে চায়, তাকে অবশ্যই এই সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটাতে হবে। এবং সন্দেহ দূরীকরণেরও উপায় আছে। শুধু 'আমি বিশ্বাস করি' অথবা 'সন্দেহ করি না' বলে অবশ্যই সমস্যার সমাধান ঘটবে না। কাউকে কোনও জিনিস বিশ্বাস করতে ও না-বুঝে গ্রহণ করতে জোর করা রাজনৈতিক, এবং তা পারমার্থিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক নয়।

সন্দেহ দূরীভূত করতে বুদ্ধ সবসময় উৎসুক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্বে, তিনি তাঁর শিষ্যদের কয়েকবার বলেছিলেন যে, তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ থাকলে তাঁকে তা অবহিত করতে এবং পরবর্তীকালে ওই সমস্ত সন্দেহ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন করতে না পেরে দুঃখ অনুভব না করার জন্য। কিন্তু শিষ্যরা ছিলেন নীরব। তারপর তিনি যা বলেছিলেন তা ছিল মর্মস্পর্শী, 'যদি শাস্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কোনও কিছু জিজ্ঞেস না করেন, তাহলে আপনাদের মধ্য থেকে যে-কেউ তার বন্ধুকে অবহিত করুন' (কাউকে তার বন্ধুকে বলতে দিন যাতে, পরে, অন্যের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করতে পারেন)।[১০]

শুধু চিন্তার মুক্তি নয়, ধর্মসমূহের ইতিহাসের শিক্ষার্থীর প্রতি বুদ্ধ-অনুমোদিত সহিষ্ণুতা বিরলপ্রজ সুন্দর। একসময় নালন্দায় নিগন্থ নাথপুত্তের (জৈন মহাবীর) সুপরিচিত শিষ্য উপালি নামক বিখ্যাত ধনী গৃহস্থ মহাবীর কর্তৃক উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এবং কর্মতত্ত্বের নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর যুক্তিতর্কে তাঁকে পরাস্ত করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কারণ, বিষয়টির ওপর বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি মহাবীরের[১১] থেকে ভিন্ন ছিল। প্রত্যাশার চাইতে সম্পূর্ণ বিপরীতে, উপালি, আলোচনার উপসংহারে, বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক এবং ওই গুলোতে তার গুরু ভুল—তা ভালোভাবে বুঝেছিলেন—তাই তিনি বুদ্ধের কাছে নিজেকে তাঁর গৃহী শিষ্য (উপাসক) করে নিতে প্রার্থনা করলেন। কিন্তু বুদ্ধ তাকে পুনঃবিবেচনা করতে এবং তাড়াহুড়া না করতে বললেন—'আপনার মতো সুপরিচিত মানুষের জন্য সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা উত্তম'। যখন উপালি তার অভিপ্রায় পুনরায় প্রকাশ

---

১০. দীঘ-নিকায় II (কলম্বো, ১৯২৯), পৃ. ৯৫; অঙ্গুত্তর-নিকায় (কলম্বো, ১৯২৯), পৃ. ২৩৯

১১. মহাবীর, জৈনধর্মের প্রবর্তক, বুদ্ধের সমসাময়িক এবং সম্ভবত বুদ্ধের চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো ছিলেন।

করলেন তখন বুদ্ধ তাকে অনুরোধ করলেন তার প্রাক্তন গুরুর প্রতি আগের মতো সম্মান ও সমর্থন বহাল রাখার জন্য।[১২]

সহিষ্ণুতা ও বোধের এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ভারতের বিখ্যাত বুদ্ধমতাবলম্বী সম্রাট অশোক, তাঁর সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যে অন্যসকল ধর্মসমূহকে সম্মান এবং সমর্থন জানিয়েছিলেন। আজও পড়া যায় এমন, পাথরে খোদাইকৃত তাঁর অধ্যাদেশগুলোর একটিতে সম্রাট ঘোষণা করেছিলেন : "শুধু নিজের ধর্মকে সম্মান করা ও অন্যধর্মের নিন্দা করা কারও ঠিক নয়, বরং যেকোনও ব্যাপারে অন্যধর্মকে সম্মানপ্রদর্শন উচিত। এইভাবে একজন নিজের ধর্মের প্রসারে সহায়তা করে এবং বিনিময়ে অন্যদের ধর্মগুলোরও সেবা করে। অন্যথা ঘটলে, নিজের ধর্মের কবর খুঁড়ে এবং অন্যের ধর্মেরও ক্ষতি করে। প্রকৃতপক্ষে নিজের ধর্মের প্রতি অনুগত হয়ে, 'আমি আমার ধর্মকে উজ্জ্বল করব' এমন চিন্তায় যেকোনও লোক তার নিজের ধর্মকে সম্মান এবং অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে। কিন্তু, ফলে, তেমন করতে গিয়ে, সে তার নিজের ধর্মকে বহুলাংশে আহত করে। তাই মতৈক্য শুভ : সবাইকে শুনতে দিন, এবং অন্যের অনুসৃত মতবাদ শুনতে ইচ্ছুক হোন।"[১৩]

আমাদের এখানে যোগ করা উচিত যে, এই সহানুভূতিপূর্ণ বোধশক্তির চেতনা শুধু ধর্মীয় মতবাদের বেলায় নয়, যেকোনও ব্যাপারেও প্রয়োগ করা যথার্থ।

সহিষ্ণুতা এবং বোধের এই চেতনা বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও সভ্যতার শুরু থেকেই সবচেয়ে বেশি লালিত আদর্শ। এ কারণেই, মানুষকে বুদ্ধমতাবলম্বী করতে অথবা ২৫০০ বছরের দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে এর বিস্তারে, নির্যাতন বা রক্তপাতের একটিও নজির নেই। আজ ৫০০ মিলিয়নের অধিক অনুসারী নিয়ে তা এশিয়া মহাদেশের সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে বিস্তৃত। যেকোনও অজুহাতে যেকোনও ধরনের সংঘাত সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধশিক্ষার পরিপন্থি।

প্রশ্নটি প্রায়শই করা হয় : বুদ্ধমতবাদ ধর্ম নাকি দর্শন? আপনি যেনামেই এটাকে ডাকেন না কেন তা কোনও বিষয় না। যেকোনও তকমা লাগান না কেন বুদ্ধমতবাদ যা, তা-ই থাকবে। এমনকী আমরা বুদ্ধের শিক্ষাকে 'বুদ্ধমতবাদ'-এর যে তকমা দিই তাও সামান্য গুরুত্বপূর্ণ। কারও দেওয়া নামটি অপরিহার্য নয়।

একটা নামে কী আসে যায়? যেটিকে আমরা গোলাপ নামে ডাকি,
অন্য যেকোনও নামেও সুগন্ধ বিলাতো।

---

১২. উপালি-সুত্ত, ন. ৫৬, মজ্ঝিম-নিকায়।
১৩. অশোক-শিলালিপি ১২ ।

একইভাবে সত্যের কোনও তকমার প্রয়োজন নেই: এটা না-বৌদ্ধ, না-খ্রিস্টান, না-হিন্দু, না-মুসলমান। এটা কারও একক দখলে নেই। স্বাধীন সত্য উপলব্ধির পথে সাম্প্রদায়িক তকমাগুলো একটা বাধা এবং সেগুলো মানুষের মনে ক্ষতিকর অপরিপক্ক বোধের জন্ম দেয়।

এটা শুধুই বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পারমার্থিক বিষয়ের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, মানুষের সম্পর্কের বেলায়ও সত্য। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা একজন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, আমরা তার দিকে একজন মানুষ হিসেবে দৃষ্টিপাত করি না; কিন্তু তার ওপর তকমা লাগাই ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান, আমেরিকান অথবা ইহুদি হিসেবে এবং মনের সকল অপরিপক্কতায় সংগঠিত মোড়ক দিয়ে তাকে বিবেচনা করি। আমরা যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য আরোপ করে তাকে ধারণা করে নিই হয়ত তিনি সে-সমস্ত বিষয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

মানুষ বৈষম্যমূলক মোড়কগুলো ভালোবাসে, তাই তারা সবার জন্য একই মনুষ্যগুণ ও আবেগ আরোপে চলে যায়। তারা বিভিন্ন ধরনের তকমার সেবার কথা বলে, উদাহরণস্বরূপ, বৌদ্ধ সেবা অথবা খ্রিস্টীয় সেবা। এবং অন্য তকমার সেবার দিকে দৃষ্টি নামিয়ে দেখে। কিন্তু সেবা সাম্প্রদায়িক হতে পারে না; এটা না-খ্রিস্টান, না-বৌদ্ধ, না-হিন্দু, না-মুসলমান। একজন মায়ের তার সন্তানের প্রতি ভালোবাসা না-বৌদ্ধ, না-খ্রিস্টান : এটা মায়ের ভালোবাসা। ভালোবাসা, সেবা, সমবেদনা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, বন্ধুতা, আকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা, শুভতা-অশুভতা, অজ্ঞতা, আত্ম-অহংকার প্রভৃতির কোনও সাম্প্রদায়িক তকমার প্রয়োজন নেই; তা কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের অধীনে নেই।

সত্য ধারণা কোত্থেকে এলো তা জানা একজন অনুসন্ধানীর জন্য নিরর্থক। একটি ধারণার উৎস ও উন্নয়ন হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার। এমনকী, প্রকৃতপক্ষে, সত্য বোঝার ক্ষেত্রে, শিক্ষাটি বুদ্ধ না অন্য কারও থেকে এলো তা জানা প্রয়োজনীয় নয়। ব্যাপারটি দেখা ও বোঝা প্রয়োজনীয়। মজ্ঝিম-নিকায়ে (সূত্র নং ১৪০) একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প আছে যা তা ব্যাখ্যা করে।

বুদ্ধ একদা একরাত্রি এক কুমারের ছাউনিতে কাটিয়েছিলেন। একই ছাউনিতে আরও একজন তরুণ সন্ন্যাসী ছিলেন যিনি পূর্বেই অবস্থান নিয়েছিলেন।[১৪] বুদ্ধ যুবক ছেলেটিকে পর্যবেক্ষণ করে ভাবলেন, 'সন্তুষ্টি এই ছেলেটির পাথেয়। তার

---

১৪. ভারতে কুমারের ছাউনিগুলো প্রশস্ত ও শান্ত। শ্রমণ-সন্ন্যাসী এবং স্বয়ং বুদ্ধেরও ভ্রমণের সময় রাত্রি ছাউনিতে কাটানোর উল্লেখ পালিগ্রন্থসমূহে রয়েছে।

সম্পর্কে জানাটা ভালো হবে।' তাই বুদ্ধ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে ভিক্ষু[১৫] আপনি কার নামে গৃহত্যাগ করেছেন? অথবা আপনার আচার্য কে? অথবা আপনি কার মতবাদ ভালোবাসেন?'

'হে বন্ধু', যুবক লোকটি উত্তর দিলেন, 'গৌতম নামে, শাক্যবংশজাত, একজন শ্রমণ আছেন, যিনি শাক্য-সংসার ত্যাগ করেছিলেন সন্ন্যাসী হওয়ার বাসনায়। অর্হৎ অথবা পূর্ণআলোকিত একজন হিসেবে তাঁকে ঘিরে এক উচ্চ সুনাম আছে। আমি ওই প্রশংসিতজনের নামে সন্ন্যাসী হয়েছি। তিনি আমার গুরু এবং আমি তাঁর শিক্ষা ভালোবাসি।'

'সেই প্রশংসিত, অর্হৎ, পূর্ণ আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বর্তমানে কোথায় বাস করেন?'

'দেশের উত্তরে সাবত্থি নামক শহর আছে বন্ধু। সেই প্রশংসিত, অর্হৎ, পূর্ণ আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বর্তমানে সেখানে বাস করছেন।'

'আপনি কি কখনও সেই প্রশংসিত লোকটিকে দেখেছেন? আপনি কি তাঁকে দেখলে চিনতে পারবেন?'

'আমি কখনও সেই প্রশংসিত লোকটিকে দেখিনি। তাঁকে দেখলে চিনতেও পারবো না।'

বুদ্ধ উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর নামেই এ অপরিচিত যুবক গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন। কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন রেখে তিনি বললেন, 'হে ভিক্ষু, আমি আপনাকে শিক্ষাটি প্রদান করব। শুনুন, মনোযোগ দিন। আমি বলবো।'

সম্মতিসহকারে যুবক বললেন,'অতীব উত্তম, বন্ধু।'

তারপর, বুদ্ধ সত্য সম্পর্কে যুবকটির উদ্দেশে তাৎপর্যপূর্ণ এক বক্তব্য দিলেন। যুবক সন্ন্যাসী পুক্কুসাথি, বক্তব্য সমাপ্ত হওয়ার পরই শুধু, অনুধাবন করতে পারলেন, তার সঙ্গে যিনি কথা বলেছেন, তিনি স্বয়ং বুদ্ধ। তাই তিনি বুদ্ধের

---

১৫. এখানে এটা উল্লেখ করা চমকপ্রদ ব্যাপার যে, বুদ্ধ এই একান্তবাসীকে ভিক্ষু বলে সম্বোধন করেন যা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বেলায় ব্যবহৃত হয়। পরিণামে দেখা যাবে যে তিনি ভিক্ষু ছিলেন না, সঙ্ঘসদস্য ছিলেন না, তাই তিনি বুদ্ধকে অনুরোধ করেন তাঁকে সঙ্ঘভুক্ত করার জন্য। সম্ভবত বুদ্ধযুগে ভিক্ষু অভিধা অন্যান্য সন্ন্যাসীর বেলায়ও সমভাবে ব্যবহৃত হতো। অথবা এমন সম্বোধন প্রয়োগে বুদ্ধ কঠোরতা অবলম্বন করেননি। ভিক্ষু মানে 'ভিক্ষারত','যে খাদ্য ভিক্ষা করে' এবং সম্ভবত আক্ষরিক অর্থেও মূলচিন্তায় এটা এখানে ব্যবহৃত হতো। থেরবাদী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ভিক্ষু অভিধা শুধু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বেলায় ব্যবহৃত হয়।

সামনে গিয়ে হাঁটুগেড়ে বসে, তাঁকে না-চিনে বন্ধু[১৬] সম্বোধন করার জন্য, ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। এরপর তিনি বুদ্ধের কাছে প্রবজ্যা-গ্রহণ করার এবং সঙ্ঘভুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করলেন।

বুদ্ধ তাকে তার ভিক্ষাপাত্র ও চীবর প্রস্তুত আছে কি না জিজ্ঞেস করলেন। (একজন ভিক্ষুর অবশ্যই ত্রিচীবর এবং খাদ্য অন্বেষণের জন্য ভিক্ষাপাত্র থাকতে হয়।) যখন পুক্কুসাথি নাবোধক উত্তর জ্ঞাপন করলেন, বুদ্ধ বললেন, যে-ব্যক্তির পাত্র-চীবর প্রস্তুত নেই তথাগত তাকে প্রবজ্যাপ্রদান করেন না। ফলে পুক্কুসাথি পাত্র-চীবরের সন্ধানে বাইরে গেলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উন্মত্ত ষাঁড়ের আক্রমণে আহত হয়ে মারা গেলেন।[১৭]

পরে, যখন এই দুঃসংবাদ বুদ্ধের কাছে পৌঁছল, তিনি ঘোষণা করলেন যে পুক্কুসাথি একজন জ্ঞানী মানুষ, যিনি ইতঃপূর্বে সত্যদর্শন ও নির্বাণলাভের শেষ পূর্বস্তরের জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছিলেন এবং তিনি এমন এক লোকে উপনীত হয়েছিলেন যেখানে তিনি অর্হৎ[১৮] হয়ে যান এবং চিরতরে মুক্তিলাভ করেন, এই পৃথিবীতে তিনি আর কখনও ফিরে আসবেন না।[১৯]

এই গল্প থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে, পুক্কুসাথি যখন বুদ্ধের কথামালা শুনছিলেন এবং তাঁর শিক্ষা অনুধাবন করছিলেন, তখন তিনি জানতেন না যে তিনি যার সঙ্গে কথা বলছিলেন অথবা যিনি শিক্ষা দিচ্ছিলেন তিনি কে! তিনি সত্য দেখেছিলেন।

---

১৬. আবুসো শব্দটির ব্যবহার বন্ধু অর্থ প্রকাশ করে। সমকক্ষদের মধ্যে এটা একটি সম্মানজনক শব্দ। কিন্তু বুদ্ধকে সম্বোধন করার বেলায় কখনওই শিষ্যরা এ শব্দটি ব্যবহার করেননি। তার বদলে তারা ভন্তে শব্দটি ব্যবহার করতেন, যার মানে মহোদয় বা প্রভুর কাছাকাছি। বুদ্ধের সময়ে, ভিক্ষুসঙ্ঘের সদস্যরা একজন আরেকজনকে আবুসো 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু বুদ্ধ তার মৃত্যুর পূর্বে কনিষ্ঠ ভিক্ষুদেরকে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের প্রতি ভান্তে 'মহোদয়' অথবা আয়ুষ্মান 'পূজনীয়' হিসেবে সম্বোধন করার জন্য নির্দেশনা দেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠদের কনিষ্ঠ সদস্যদের প্রতি নাম ধরে অথবা আবুসো 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করা উচিত। (দীঘ-নিকায় II কলম্বো, ১৯২৯, পৃ. ৯৫)। এই রীতি আজকের দিন পর্যন্ত সঙ্ঘে চলমান রয়েছে।

১৭. ভারতবর্ষের রাস্তাঘাটে গরুর বিচরণ সুবিদিত। এই সূত্র থেকে মনে হচ্ছে প্রথাটি অনেক পুরোনো। কিন্তু সাধারণত গরুগুলো বাধ্য, এবং হিংস্র বা বিপজ্জনক নয়।

১৮. অর্হৎ একজন ব্যক্তি যিনি নিজেকে কামনা, হিংসা, ঘৃণা, অশুভ ইচ্ছা, অজ্ঞতা, অহংকার, আত্মাভিমান ইত্যাদির ন্যায় সকল কলুষতা ও অশুদ্ধতা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি নির্বাণ উপলব্ধির চতুর্থ বা সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন, এবং প্রজ্ঞা, করুণার মতো বিশুদ্ধ ও উন্নত গুণাবলিতে পরিপূর্ণ। পুক্কুসাথি মুহূর্তে শুধু তৃতীয় স্তর লাভ করেছিলেন যেটাকে পারিভাষিকভাবে অনাগামী বা 'চিরতরে না-ফেরা' ডাকা হয়। দ্বিতীয় স্তরকে সুকৃতাগামী 'একবার-ফেরা' ডাকা হয় এবং প্রথমস্তরকে স্রোতাপন্ন 'স্রোতেপতিত' ডাকা হয়।

১৯. কার্ল জেল্লেরাপের *দ্য পিলগ্রিম কমনিটা* মনে হয় পুক্কুসাথির এই গল্পদ্বারা অনুপ্রাণিত।

ওষুধ যদি ভালো হয়, রোগমুক্তি ঘটবে, এটা কে প্রস্তুত করেছেন বা এটা কোত্থেকে এসেছে জানাটা দরকারি নয়।

প্রায় সকল ধর্মই বিশ্বাসের ওপর নির্মিত—বরং 'অন্ধ' বিশ্বাসই দেখা যায়। কিন্তু বুদ্ধমতবাদে 'দেখা', জানা ও বোঝার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, আস্থা বা বিশ্বাসের প্রতি নয়। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে সদ্ধা (সংস্কৃতে শ্রদ্ধা) যা সচরাচর আস্থা বা বিশ্বাস অর্থে গৃহীত হয়। কিন্তু সদ্ধা আস্থার মতো নয় বরং তা বিচারের মাধ্যমে উৎপন্ন প্রত্যয়। লোকপ্রিয় বুদ্ধমতবাদে এবং গ্রন্থে সাধারণ ব্যবহারেও সদ্ধা শব্দটির, অবশ্যই স্বীকৃত, এই অর্থে বিশ্বাসের উপাদান আছে যে তা বুদ্ধ, ধম্ম (শিক্ষা), সঙ্ঘ (সংগঠন)-এর প্রতি নিবিষ্টতা বোঝায়।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মহান বৌদ্ধদার্শনিক, আসঙ্গের মতে, শ্রদ্ধার তিনটি রূপ আছে : (১) বিষয়বস্তু যা, তা সম্পর্কে যথাযথ পূর্ণ ও দৃঢ় প্রত্যয়, (২) ভালো গুণাবলিসমূহে নির্মল আনন্দ এবং (৩) অভীষ্ট বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা বা কামনা।[২০]

আপনি এটাকে যেভাবেই নেন না কেন , অন্যান্য ধর্মসমূহে অনুধাবন করা বিশ্বাস অথবা আস্থা দিয়ে বুদ্ধমতবাদে অল্পই করার আছে।[২১]

কোনও কিছু না-দেখা গেলে বিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে—শব্দের প্রত্যেক অর্থেই দেখা। যে মুহূর্তে আপনি দেখতে পান, সে মুহূর্তে বিশ্বাস অদৃশ্য হয়ে যায়। যদি আমি আপনাকে বলি যে মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের তালুতে রত্ন লুকানো আছে, বিশ্বাসের প্রশ্ন জেগে উঠবে, কারণ আপনি তা সরাসরি দেখতে পান না। কিন্তু আমি যদি আমার হাতের মুঠি খুলি, এবং আপনাকে রত্ন দেখাই, তখন আপনি স্বয়ং দেখবেন এবং বিশ্বাসের প্রশ্ন আর জাগবে না। তাই প্রাচীন বৌদ্ধিক গ্রন্থে একটা প্রবাদে বলে, 'বুঝতে পারা হচ্ছে কারও হাতের তালুতে রত্ন বা হরতুকি দেখা।'

মুসীলা নামক বুদ্ধের এক শিষ্য অন্য এক ভিক্ষুকে বলেন, 'বন্ধু সাবিত্থা, ভক্তি, বিশ্বাস বা আস্থা[২২] ছাড়া, পছন্দ বা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া, শ্রুতি বা প্রথা ছাড়া, আপাত সত্য আমলে না-নিয়ে, আনুমানিক বিষয়ে আনন্দিত না-হয়ে, আমি জানি ও দেখি যে, হয়ে ওঠার বিরতিই নির্বাণ।'[২৩]

---

২০. অভিসমুচ্চয়, পৃ. ৬

২১. ইডিথ লুডউইক-জ্যমরই দ্বারা রচিত *দ্য রোল অব দ্য মিরাকেল* ইন আর্লি *পালি লিটারেচারে* এ বিষয়টি আছে। দুর্ভাগ্যবশত এ পিএইচ.ডি. থিসিসটি এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। একই বিষয়ে একই লেখকের প্রবন্ধ দেখুন সিলন ইউনিভার্সিটি রিভিউয়ে, ভলিয়ম-১, ন.১ (এপ্রিল, ১৯৪৩), পৃ.৭৪।

২২. এখানে সদ্ধা শব্দটি সাধারণ জনপ্রিয় ধারণায় 'ভক্তি, আস্থা, বিশ্বাস' অর্থে ব্যবহৃত।

২৩. সংযুক্ত-নিকায় II পৃ.১১৭

এবং বুদ্ধ বলেন, 'হে ভিক্ষু, আমি বলি যে, কলুষ আর অশুদ্ধতা বিনাশ হচ্ছে সে ব্যক্তির জন্য, যে জানে ও দেখে, এবং যে জানে না ও দেখে না তার জন্য নয়।'[২৪]

এটা সব সময়ই জানা ও দেখার প্রশ্ন, বিশ্বাস করার নয়। বুদ্ধের শিক্ষা 'এহি-পস্‌সিক' হিসেবে উত্তীর্ণ, আপনাকে আমন্ত্রণ জানায়, 'আসো এবং দেখো', কিন্তু আসতে এবং বিশ্বাস করতে নয়।

কোনও ব্যক্তির সত্য উপলব্ধি বুঝাতে বৌদ্ধগ্রন্থসমূহের সর্বত্র উল্লিখিত অভিব্যক্তিগুলো হচ্ছে : 'সত্যের নির্মল ও নিষ্কলুষ চক্ষু (ধম্ম-চক্‌খু) উৎপন্ন হয়েছে। তিনি সত্য দেখেছেন, সত্য লাভ করেছেন, সত্য জেনেছেন, সত্য গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন, সন্দেহমুক্ত হয়েছেন, দুদোল্যমানতা ছাড়া। এভাবে ঠিক প্রজ্ঞা দ্বারা তিনি যথাযথভাবে (যথা ভূতম)[২৫] দেখেন।' নিজের বোধিলাভের কথা উল্লেখ করে বুদ্ধ বলেছেন , 'চক্ষু জন্ম নিয়েছিল, আলো জন্ম নিয়েছিল।'[২৬] জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে (ঞাণ-দস্‌সনা) সব সময় দেখা যায় এবং আস্থার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসে নয়।

এটা সেই সময় খুবই মূল্যায়িত হয়েছিল যখন ব্রাহ্মণ্য গোঁড়া-প্রথা অসহিষ্ণুভাবে বিশ্বাস করতে এবং তাদের প্রথা ও কর্তৃত্ব বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করতে জোর করত। একদা একদল শিক্ষিত ও সুপরিচিত ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। দলের একজন, ষোলো বছর বয়সের যুবক ব্রাহ্মণ, নাম কাপথিক, তাদের সকলের বিবেচনায় অসাধারণ মেধাবী, বুদ্ধের প্রতি প্রশ্ন রাখলেন—[২৭]

"পুজনীয় গৌতম, ব্রাহ্মণদের প্রাচীন পবিত্র গ্রন্থসমূহ অবিকৃতভাবে শ্রুতি-পরম্পরায় আগত। সেগুলোর বিষয়ে ব্রাহ্মণগণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : 'পরমব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং বাকি সব মিথ্যা।' এখন পূজনীয় গৌতম এ-ব্যাপারে কী বলেন?"

বুদ্ধ জানতে চাইলেন : "ব্রাহ্মণদের মধ্যে কি এমন একজন আছেন যিনি দাবি করতে পারেন তিনি অবগত আছেন ও প্রত্যক্ষ করেছেন,'পরমব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এবং বাকি সব মিথ্যা'?" যুবক ছিলেন স্পষ্টভাষী, 'না' বললেন।

---

২৪. প্রাগুক্ত. III, পৃষ্ঠা. ১৫২.
২৫. সংযুক্ত-নিকায় V (PTS), পৃ. ৪২৩; III পৃ. ১০৩; মজ্ঝিম-নিকায় III (PTS), পৃ.১৯
২৬. সুমঙ্গলবিলাসিনী (PTS), পৃ. ৪২২
২৭. চঙ্কি-সুত্ত, ৯৫ন., মজ্ঝিম-নিকায়।

''তাহলে, সাতপুরুষ পেছন থেকে ব্রাহ্মণদের কোনও একজন আচার্য, আচার্যের আচার্য অথবা ওই গ্রন্থসমূহের মূল প্রণেতাদের মধ্যে একজনও কি দাবি করতে পারেন তিনি অবগত আছেন ও প্রত্যক্ষ করেছেন, 'পরমব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এবং বাকি সব মিথ্যা'?''

'না'

'তাহলে, এটা একটা অন্ধ লোকদের সারির মতো, প্রত্যেকেই পূর্ববর্তী জনকে ধরে আছেন; প্রথমজন দেখেন না, মাঝের জনও দেখেন না, শেষের জনও দেখেন না। এই কারণে ব্রাহ্মণদের দশা আমার কাছে একদল অন্ধ লোকের সারির মতো মনে হচ্ছে।'

তারপর বুদ্ধ ব্রাহ্মণদের প্রতি চরম-গুরুত্বের উপদেশ প্রদান করেন : ''যিনি সত্য প্রতিপালন (সত্যরক্ষা) করেন সেই জ্ঞানীর জন্য 'পরমব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এবং বাকি সব মিথ্যা' —এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয়।''

ব্রাহ্মণ যুবকের প্রশ্নকৃত সত্য-প্রতিপালন ও সত্য-রক্ষার ধারণা ব্যাখ্যায় বুদ্ধ বলেন, ''একজন মানুষের আস্থা আছে। যদি তিনি বলেন 'এই আমার আস্থা', ততদূর তিনি সত্য প্রতি পালন করেন। কিন্তু তা দ্বারা তিনি 'পরমব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং বাকি সব মিথ্যা' এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন না।'' অন্য অর্থে, একজন মানুষ যা ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পারেন, এবং তিনি বলতে পারেন, 'আমি এটা বিশ্বাস করি', তদ্দূর তিনি সত্যকে সম্মান করেন। কিন্তু বিশ্বাস ও আস্থার কারণে তিনি বলতে পারেন না যে, তিনি যা বিশ্বাস করেন তা-ই একমাত্র সত্য, এবং বাকি সব মিথ্যা।

বুদ্ধ বলেন, 'কোনও ব্যাপারে (নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি) অত্যাসক্ত হওয়া এবং অন্য যেকোনও ব্যাপার (দৃষ্টিভঙ্গি) নিম্নতর হিসেবে নিন্দা করা- জ্ঞানীগণ পায়ে বেড়ি পরা বলে অভিহিত করেন।' [২৮]

একদিন বুদ্ধ কার্য-কারণ নীতি তাঁর শিষ্যদের ব্যাখ্যা করলেন[২৯], এবং তারা বললেন যে তারা তা পরিষ্কারভাবে দেখেছেন ও বুঝেছেন। তারপর বুদ্ধ তাদের বললেন—

---

২৮. সুত্ত-নিপাত (PTS), পৃ.১৫১ (ভ.৭৯৮)

২৯. মহাতণ্হাসংখয়-সুত্ত, ন.৩৮, মজ্ঝিম-নিকায়

"হে ভিক্ষুগণ, এমনকী এই দৃষ্টিভঙ্গী, যা খুব নিখাদ ও স্বচ্ছ, যদি আপনারা তা আঁকড়ে ধরে থাকেন, যদি আপনারা তাতে অনুরাগ দেখান, যদি আপনারা এটাকে 'সাতরাজার ধন' করে ফেলেন, যদি এতে অনুরক্ত হয়ে যান, তাহলে আপনারা বুঝতে পারেননি যে, এই শিক্ষা ভেলার ন্যায়, যা পারাপারের জন্য, আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য নয়।"[৩০]

অন্যত্র বুদ্ধ এই বিখ্যাত উপমা ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে তাঁর শিক্ষাকে পারাপারের ভেলার সঙ্গে তুলনা করেছেন, এবং কারওর কাঁধে করে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য নয়—

"হে ভিক্ষুগণ, একজন মানুষ ভ্রমণে আছেন। তিনি বিপুল জলরাশির কাছে এলেন। এই দিকের তীর বিপদসঙ্কুল, কিন্তু অন্যটি নিরাপদ ও বিপদমুক্ত। কোনও নৌকাই নিরাপদ ও বিপদমুক্ত অন্য পারের দিকে যায় না, এমনকী পারাপারের কোনও সেতুও নেই। তিনি মনে মনে বললেন—'এই জলসমুদ্র বিশাল এবং এই দিকের তীর বিপদসঙ্কুল, কিন্তু অন্যটি নিরাপদ ও বিপদমুক্ত। কোনও নৌকাই অন্যপারের দিকে যায় না, এমনকী পারাপারের কোনও সেতুও নেই। অতএব, ঘাস, কাঠ, ডালপালা ও পাতা দিয়ে একটি ভেলা তৈরি করাই উত্তম হবে এবং আমার হাত-পা চালিয়ে ভেলার সাহায্যে অন্যপারে নিরাপদে নিজেকে নিয়ে যাব।' তারপর হে ভিক্ষুগণ, ওই লোকটি ঘাস, কাঠ, ডালপালা ও পাতা সংগ্রহ করলেন ভেলা বানানোর জন্য, হাত-পা চালিয়ে ভেলার সাহায্যে অন্য পারে নিরাপদে নিজেকে নিয়ে গেলেন। নিরাপদে পার হয়ে এবং পারে এসে তিনি ভাবলেন: 'এই ভেলাটি আমার জন্য খুব উপকারী ছিল, এর সহায়তায় আমি আমার হাত-পা চালিয়ে নিরাপদে এপারে এসেছি। যদি আমি এটাকে আমার মাথায় বা কাঁধে করে, যেখানেই যাই না কেন সেখানে, নিয়ে যাই ভালো হবে।'

—'আপনারা কী ভাবছেন, হে ভিক্ষুগণ, যদি তিনি এমনটি করে থাকেন, তার দ্বারা কি ভেলার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন হলো?'
—'না ভন্তে।'

—'তবে কোন পন্থায় তিনি ভেলার প্রতি যথাযথ সম্মান জানাতে পারতেন?'

—নিরাপদে পার হয়ে লোকটির এইরকম ভাবা উচিত, 'এ ভেলাটি আমার জন্য খুব উপকারী ছিল, এর সহায়তায় আমি আমার হাত-পা চালিয়ে নিরাপদে এপারে

---

৩০. মজ্ঝিম-নিকায় I (PTS), পৃ. ২৬০

এসেছি। যদি আমি এটাকে তীরের ওপর রেখে দিই অথবা নোঙর করে ভাসিয়ে দিই এবং, যেকোনও জায়গায় হোক, আমার পথে চলে যাই ভালো হবে।

হে ভিক্ষুগণ, ঠিক একইভাবে, আমি যে মতবাদ শিক্ষা দিয়েছি তা ভেলাসদৃশ—তা পারাপারের জন্য, বহনের জন্য নয় (আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য নয়)। হে ভিক্ষুগণ, আপনারা যারা বোঝেন যে শিক্ষাটি ভেলার ন্যায়, এমনকী ভালো জিনিস (ধম্ম) পরিত্যাগ করা উচিত; তাহলে আরও বেশি খারাপ জিনিস (অধম্ম) আপনাদের পরিত্যাগ করা উচিত।"[৩১]

এই রূপক থেকে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, বুদ্ধশিক্ষার মানে হচ্ছে মানুষকে নিরাপদে, শান্তিতে, সুখে, অপ্রমত্ততায়, নির্বাণ লাভে নিয়ে যাওয়া। বুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ মতবাদ এই প্রান্তের দিকে পরিচালিত করে। তিনি কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল মেটানোর কথা বলে যাননি। তিনি ছিলেন কর্মবাদী শিক্ষক, এবং সেই সমস্ত ব্যাপারই শিক্ষা দিয়েছিলেন যেগুলো মানুষের সুখ ও শান্তি নিয়ে আসে।

বুদ্ধ একদা কোসাম্বির (এলাহাবাদের কাছে) সিম্‌সাপা অরণ্যে অবস্থান করছিলেন। তাঁর হাতে কিছু পাতা নিয়ে শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন—'হে ভিক্ষুগণ, কোনগুলো বেশি? আমার হাতের এই পাতাগুলো নাকি অরণ্যের পাতাগুলো?'

'ভন্তে, তথাগতের হাতের পাতাগুলো যৎসামান্য, কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, সিম্‌সাপা অরণ্যের পাতাগুলো অনেক অনেক বেশি।'

'ঠিক এরকমই, ভিক্ষুগণ, আমি যতটুকু জানি, তার অল্পই বলেছি, আর যা বলিনি তার পরিমাণই বিপুল। এবং কেন আমি ওগুলো বলিনি? কারণ তা প্রয়োজনীয় নয়... নির্বাণের দিকে পরিচালনা করে না। এই কারণে আমি আপনাদের ওইসকল বিষয় বলিনি।"[৩২]

যা জেনেও বুদ্ধ আমাদের বলেন নি সে-সম্পর্কে অনুমান করা নিষ্ফল, যেরকম কিছু পণ্ডিত বৃথা-চেষ্টা করেন। বুদ্ধ অপ্রয়োজনীয় অধিবিদ্যামূলক প্রশ্নের জবাব দিতে আগ্রহী ছিলেন না যেগুলো সম্পূর্ণ অনুমান-নির্ভর এবং কাল্পনিক সমস্যা তৈরি করে। তিনি সেগুলোকে 'মতামতের নিষ্প্রাণ বিস্তার' হিসেবে বিবেচনা

---

৩১. মজ্ঝিম-নিকায় I (PTS), পৃ. ১৩৪-১৩৫, এখানে ধর্ম, টীকা অনুযায়ী, মানে উচ্চ পারমার্থিক প্রাপ্তি এবং শুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা। এমনকী এগুলোতে অনুরক্ত হওয়া, সেগুলো উচু ও পবিত্র হতে পারে, পরিত্যাগ করা উচিত; তাহলে অশুভ ও খারাপ জিনিসের বিবেচনায় এগুলো কত বেশি হতে পারে। মজ্ঝিম-নিকায় অট্‌ঠকথা, পপঞ্চসূদনি II (PTS), পৃ. ১০৯

৩২. সংযুক্ত-নিকায় V (PTS) পৃ. ৪৩৭।

করেছিলেন। তাঁর কিছু শিষ্য এই সমস্ত আচরণ মন থেকে মেনে নিতে পারেননি বলে মনে হয়। তাদের মধ্যে মালুঙ্ক্যপুত্ত নামক একজনের উদাহরণ আছে, যিনি বুদ্ধ-সমীপে দশটি সু-পরিচিত ধ্রুপদী অধিবিদ্যামূলক প্রশ্ন রাখেন এবং উত্তরপ্রার্থী হন।[৩৩]

একদিন মালুঙ্ক্যপুত্ত তার দুপুরের ধ্যান থেকে উঠে বুদ্ধের কাছে গিয়ে, অভিবাদন জানিয়ে, একপাশে বসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—

"ভন্তে, যখন আমি একাকী ধ্যান করি, আমার এই ভাবনাগুলোর উদয় হয়—এই সমস্ত সমস্যা অব্যাখ্যাকৃত, একপাশে রাখা এবং তথাগতের দ্বারা পরিত্যাজ্য। যেমন, (১) বিশ্ব কি শাশ্বত অথবা (২) শাশ্বত নয় কি, (৩) এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কি সসীম অথবা (৪) অসীম, (৫) আত্মা ও শরীর কি অভিন্ন অথবা (৬) আত্মা ও শরীর কি ভিন্ন, (৭) তথাগত কি মৃত্যুর পরে থাকেন অথবা (৮) তিনি কি মৃত্যুর পর থাকেন না, (৯) মৃত্যুর পর তিনি কি উভয় (একই সময়ে) থাকেন ও থাকেন না অথবা (১০) মৃত্যুর পর তিনি কি উভয় (একই সময়ে) না থাকেন ও না থাকেন ও না? এই সমস্যাগুলো তথাগত আমাকে ব্যাখ্যা করেন না। এটা (আচরণ) আমাকে সন্তুষ্ট করে না, আমি এর মর্ম বুঝি না। আমি তথাগতের কাছে যাব এবং তাঁকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করব। যদি ওইগুলো তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করেন, তাহলে আমি তাঁর অধীনে পবিত্র জীবনযাপন করব। যদি তিনি ওগুলো ব্যাখ্যা না-করেন তবে আমি সঙ্ঘ পরিত্যাগ করে চলে যাব। যদি তথাগত জেনে থাকেন যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শাশ্বত, তিনি আমাকে তাই ব্যাখ্যা করুন। যদি তথাগত না-জেনে থাকেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শাশ্বত কি শাশ্বত নয়, ইত্যাদি, তাহলে যে ব্যক্তি জানেন না, সোজাসুজিই বলা ভালো 'আমি জানি না, আমি বুঝি না'।"

বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বলেন মালুঙ্ক্যপুত্তের লক্ষ-মিলিয়ন লোকের ভালো করা উচিত যারা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন এই ধরনের অধিবিদ্যামূলক প্রশ্ন করে এবং অপ্রয়োজনে তাদের মনের শান্তি নষ্ট করছেন—''মালুঙ্ক্যপুত্ত, আমি কি কখনও বলেছি, 'আসেন এবং আমার অধীনে পবিত্র জীবনযাপন করেন, আমি আপনাকে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবো'?"

'না, ভন্তে।'

---

৩৩. চূল-মালুঙ্ক্য-সুত্ত, ন. ৬৩, মজ্ঝিম-নিকায়।

"তাহলে, মালুঙ্ক্যপুত্ত, এমনকী আপনি কি আমাকে বলেছেন 'ভন্তে, আমি তথাগতের অধীনে পবিত্র জীবনযাপন করব, এবং তথাগত আমাকে এই সমস্ত প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেবেন'?"

'না, ভন্তে।'

''এমনকী এখনও, মালুঙ্ক্যপুত্ত, আমি আপনাকে বলবো না : 'আসেন এবং আমার অধীনে পবিত্র জীবনযাপন করেন, আমি আপনাকে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবো' এবং আপনি আমাকে বলবেন না : ভন্তে, আমি তথাগতের অধীনে পবিত্র জীবনযাপন করব, এবং তথাগত আমাকে এই সমস্ত প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেবেন। এই পারিপার্শ্বিকতায় কে কাকে অস্বীকার করে?''[৩৪]

''মালুঙ্ক্যপুত্ত, যদি কেউ বলেন—'আমি তথাগতের অধীনে পবিত্র জীবনযাপন করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর না-দিচ্ছেন। তিনি মারা গেলেও তথাগত এই সমস্ত বিষয়ে নিরুত্তর থাকবেন। মালুঙ্ক্যপুত্ত, ধরেন, একজন মানুষ বিষাক্ত তিরে আহত, এবং তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন তাকে শল্যবিদের কাছে নিয়ে গেলেন। ধরেন, লোকটি বললেন, 'আমি এ তিরটি তুলতে দেবো না, যতক্ষণ না আমি জানছি কে আমাকে তির ছুঁড়েছে; সে কি ক্ষত্রিয় (যোদ্ধাশ্রেণি), না ব্রাহ্মণ (পুরোহিতশ্রেণি), না বৈশ্য (বণিক ও কৃষিজীবীশ্রেণি), না শূদ্র (নিম্নবর্ণ); তার নাম ও পরিবার কী হতে পারে; সে কি লম্বা, না খাটো, না মাঝারি গড়নের; তার গায়ের চামড়া কি কালো, বাদামি না সোনালি; সে কোন গ্রাম বা শহরে থাকে। আমি এই তির উপড়াতে দেবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জানতে পারছি না কী-ধরনের তিরদ্বারা আমি বিদ্ধ হয়েছি; কী-ধরনের দড়ি তিরে ব্যবহৃত হয়েছে; কী-ধরনের পালক তিরে ব্যবহৃত হয়েছে এবং কী-ধরনের ধাতু দিয়ে তিরের অগ্রভাগ নির্মিত হয়েছে।' মালুঙ্ক্যপুত্ত, ওই লোকটি এসবের কোনওটাই না-জেনে মারা যাবে। তাই মালুঙ্ক্যপুত্ত, যদি কেউ বলেন—আমি তথাগতের অধীনে পবিত্র জীবন পরিচালনা করব না, যতদিন তিনি বিশ্ব শাশ্বত কি শাশ্বত না প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর না-দিচ্ছেন।' তিনি মারা যেতে পারেন তথাগত এর উত্তর দেবেন না।''

তারপর বুদ্ধ মালুঙ্ক্যপুত্তকে ব্যাখ্যা করলেন যে, পবিত্র জীবন এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে না। এই সমস্ত সমস্যার বিষয়ে যেকোনও মতামত থাকুক, জন্ম, জরা, বার্ধক্য, মৃত্যু, দুঃখ, শোক, ব্যথা, পীড়া, আত্মযন্ত্রণা, 'যেগুলোর নিবৃত্তির (নির্বাণ) ঘোষণা আমি এই অন্তিম জীবনে দিই।'

---

৩৪. উভয়েই মুক্ত এবং কেউই অন্যের বাধ্য নয়।

অতএব, 'মালুঙ্ক্যপুত্ত, আমি যা ব্যাখ্যার তা ব্যাখ্যা করেছি, যা ব্যাখ্যার নয় তা ব্যাখ্যা করিনি। কোন জিনিসগুলো আমি ব্যাখ্যা করিনি? এই ব্রহ্মাণ্ড শাশ্বত কি না (ওই দশমতামত) আমি ব্যাখ্যা করিনি। মালুঙ্ক্যপুত্ত কেন আমি তা ব্যাখ্যা করিনি? ওইগুলো উপকারী নয়, ওইগুলো মৌলিকভাবে পারমার্থিক পবিত্র জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, বৈরাগ্যের, ক্ষান্তির, নিরাসক্তির, অপ্রমত্ততার, গভীরবোধের, পূর্ণ উপলব্ধির নির্বাণের সহায়ক নয়। এই কারণে আমি আপনাকে সেগুলো সম্পর্কে বলিনি।'

'তাহলে, মালুঙ্ক্যপুত্ত, আমি কী ব্যাখ্যা করেছি? আমি দুক্খ, দুক্খের কারণ, দুক্খের নিরোধ, দুক্খ-নিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করেছি। মালুঙ্ক্যপুত্ত, কেন আমি তা ব্যাখ্যা করেছি? কারণ তা উপকারী, পারমার্থিক পবিত্র জীবনের সঙ্গে মৌলিকভাবে সম্পৃক্ত; বৈরাগ্য, ক্ষান্তি, নিরাসক্তি, অপ্রমত্ততা, গভীরবোধ, পূর্ণউপলব্ধি, নির্বাণের সহায়ক। তাই আমি সেগুলো ব্যাখ্যা করেছি।'[৩৫]

---

৩৫. বুদ্ধের এই উপদেশ মালুঙ্ক্যপুত্রের ওপর আকাঙ্ক্ষিত প্রভাব ফেলেছিল, কারণ অন্যত্র উল্লেখ আছে যে তিনি বুদ্ধের কাছে নির্দেশনার জন্য পুনরায় গিয়েছিলেন, যা অনুসরণ করে তিনি অরহত হয়েছিলেন। অঙ্গুত্তর-নিকায় (কলম্বো,১৯২৯), পৃ. ৩৪৫-৩৪৬; সংযুক্ত-নিকায় IV (PTS), পৃ.৭২।

চতুর্থ মহাসত্য : মগ্‌গ : পথ

চতুর্থ মহাসত্য হচ্ছে সেই পন্থা যা দুক্‌খ নিরোধের দিকে পরিচালিত করে (দুক্‌খনিরোধগামিনীপতিপদা-অরিয়সচ্চ)। এটি মধ্যম পথ (মজ্ঝিমা পতিপদা) নামে পরিচিত, কারণ এটি দুইটি চরম সীমা পরিত্যাগ করে : একটি চরমসীমা হচ্ছে সুখের সন্ধানে ইন্দ্রিয়সমূহের পরিতৃপ্তি, যা 'নিম্ন, হীন, অলাভজনক এবং সাধারণ লোকের পন্থা'; অন্য চরমসীমা হচ্ছে সুখের সন্ধানে, সন্ন্যাসের নামে বিভিন্ন ধরনের কৃচ্ছসাধন যা 'যন্ত্রণাপূর্ণ, অসার ও অলাভজনক।' এই দুই অন্ত অনুশীলন করে কোনও উপকার না-পেয়ে বুদ্ধ নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে মধ্যপথ আবিষ্কার করেন, যা অভীষ্ট ও জ্ঞানপ্রদায়ী, যা শান্ততা, অন্তর্লোক, আলোকপ্রাপ্তি ও নির্বাণের দিকে পরিচালিত করে। এই মধ্যপন্থা সাধারণত অষ্টাঙ্গিক মহাপথ (অরিয়-অট্‌ঠঙ্গিক-মগ্‌গ) হিসেবে বিবেচিত হয়, কারণ এটি আটটি ভাগ বা শ্রেণি নিয়ে গঠিত, যথা—

১. সঠিক উপলব্ধি (সম্মা দিট্‌ঠি)
২. সঠিক সংকল্প (সম্মা সঙ্কপ্প)
৩. সঠিক বাক্য (সম্মা বাচা)
৪. সঠিক কর্ম (সম্মা কম্মন্ত)
৫. সঠিক জীবিকা (সম্মা আজীব)
৬. সঠিক প্রচেষ্টা (সম্মা ব্যায়াম)
৭. সঠিক স্মৃতি (সম্মা সতি)
৮. সঠিক সমাধি (সম্মা সমাধি)

বাস্তবিকভাবে, বুদ্ধের সম্পূর্ণ শিক্ষা, যাতে তিনি নিবিড়ভাবে দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে নিবিষ্ট ছিলেন, বিভিন্ন বিষয় এই মহাপথ দিয়েই পরিচালনা করেছিলেন। তিনি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন শব্দকৌশলে তাদের উন্নতির পর্যায় অনুযায়ী এবং তাঁকে বোঝার ও অনুসরণ করার সক্ষমতা অনুযায়ী তা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

পক্ষান্তরে বৌদ্ধশাস্ত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কয়েক হাজার আলোচনার সারাংশ অষ্টাঙ্গিক মহাপথে পাওয়া যায়।

এটা ভাবা উচিত নয় যে, মহাপথের আটটি ভাগ বা শ্রেণি, সঙ্খ্যানুক্রমিকভাবে একটার পর একটা, যেভাবে উপরে দেওয়া হয়েছে সেভাবে অনুশীলন ও অনুসরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু যতদূর সম্ভব প্রত্যেকটির স্বতন্ত্রভাবে কমবেশি একই সঙ্গে উন্নতি সাধন করতে হবে। সেগুলো সবকয়টি একত্রে সংযুক্ত এবং একটি আরেকটির উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করে।

এ আটটি বিষয়বস্তু তিনটি প্রয়োজনীয় বৌদ্ধিক শিক্ষা ও শৃঙ্খলার মানোন্নয়ন এবং বিশুদ্ধিতার দিকে লক্ষ্য স্থির করে,—যেমন, (ক) নৈতিক আচরণ (সীল), (খ) মানসিক শৃঙ্খলা (সমাধি), (গ) প্রজ্ঞা (পঞ্ঞা)[৩৬]। মহাপথের আটটি বিভাগের সংগতিপূর্ণ ও উত্তম উপলব্ধির জন্য এটা অধিক সাহায্যকারী হবে, যদি আমরা সেগুলোকে দলবদ্ধ করে ফেলি এবং এ তিনটি ভাগ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করি।

মহাজাগতিক প্রেম ও সকল জীবন্ত সত্তার প্রতি দয়ার ব্যাপক ধারণা, যা বুদ্ধশিক্ষার ভিত্তি, তা নৈতিক আচরণ (সীল) এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরিতাপের বিষয় যে অনেক পণ্ডিত বুদ্ধশিক্ষার এই মহৎ দিক ভুলে গিয়ে অধিবিদ্যামূলক বেপথুপনায় তৃপ্ত হন। বুদ্ধ তাঁর শিক্ষা প্রদান করেছিলেন 'জগতের প্রতি করুণাপূর্ণ হয়ে বহুজনের কল্যাণ, বহুজনের সুখের জন্য' (বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায়)।

বুদ্ধমতবাদ অনুযায়ী, একজন মানুষের পরিপূর্ণ হতে হলে দুটি গুণ সমভাবে উন্নত করা উচিত : একটি করুণা, আরেকটি প্রজ্ঞা। এখানে করুণা—ভালোবাসা, পরজনপ্রীতি, দয়া সহিষ্ণুতা ও আবেগের দিকের সব মহৎ গুণাবলি বা হৃদয়ের সৌন্দর্যের প্রতিনিধিত্ব করে, আর প্রজ্ঞা—বুদ্ধিবৃত্তিক দিক বা মনের গুণাবলিসমূহ উপস্থাপন করে। যদি কেউ বুদ্ধিবৃত্তিক দিক অবহেলা করে শুধু হৃদয়বৃত্তিক দিকের উন্নতি সাধন করতে থাকেন তবে তিনি ভালো হৃদয়ের বোকা হয়ে যেতে পারেন; আর কেউ যদি হৃদয়বৃত্তিক দিক অবজ্ঞা করে শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক দিকের উন্নতি সাধন করতে থাকেন তবে তিনি অন্যের প্রতি অনুভূতিহীন শক্ত হৃদয়ের বুদ্ধিমান মানুষে পরিণত হয়ে যেতে পারেন। পরিপূর্ণ হতে হলে সমভাবে দুটোরই উন্নতিসাধন করতে হবে। এটাই জীবনের বৌদ্ধিক পন্থার লক্ষ্য—যাতে প্রজ্ঞা ও করুণা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত, যা আমরা পরে দেখবো।

---

৩৬. মজ্ঝিম-নিকায় I (PTS), পৃ. ৩০১

প্রেম ও করুণার ওপর স্থিত নৈতিক আচরণে (সীল) অষ্টাঙ্গিক মহাপথের তিনটি অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত : যেমন, সঠিক বাক্য, সঠিক কর্ম ও সঠিক জীবিকা (তালিকা অনুযায়ী ৩, ৪ ও ৫ নম্বর)।

সঠিক বাক্য হচ্ছে ১. মিথ্যা বলা থেকে, ২. পরচর্চা, কারও প্রতি মিথ্যাকলঙ্ক লেপন ও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা-অনৈক্য-অসম্প্রীতি সৃষ্টিকারী আলাপ থেকে, ৩. কর্কশ, রূঢ়, অভদ্র, বিদ্বেষপূর্ণ ও কটূক্তিপূর্ণ বাক্য থেকে এবং ৪. অলস-নিরর্থক বকবকানি ও খোশগল্প থেকে বিরত থাকা। যখন কেউ এই সমস্ত ভুল ও ক্ষতিকর বাক্য থেকে বিরত থাকবেন, স্বাভাবিকভাবেই তাকে সত্য বলতে হবে, এমন সব শব্দ ব্যবহার করতে হবে যেগুলো বন্ধুত্বপূর্ণ ও দয়ার্দ্র, সন্তুষ্টিজনক ও ভদ্রোচিত, অর্থপূর্ণ ও উপকারী। কাউকেই বেখেয়ালির মতো কথা বলা উচিত নয়—ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় কথা বলা উচিত। যদি অর্থপূর্ণ কিছু না-বলা যায় তবে 'মহৎ নীরবতা' বাঞ্ছনীয়।

সঠিক কর্ম—আদর্শিক, সম্মানজনক ও শান্তিপূর্ণ আচরণের উৎকর্ষসাধনে লক্ষ্য স্থির রাখে। তা আমাদের জীবন ধ্বংস করা , চুরি করা, অসৎ লেনদেন ও অবৈধ যৌন সংসর্গ থেকে বিরত থাকা উচিত বলে সতর্ক করে দেয় এবং তাতে করে আমরা অন্যদেরও সাহায্য করতে পারি, যাতে তারা ঠিক পথে শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক জীবন পরিচালনা করতে পারেন।

সঠিক জীবিকা মানে, যা অন্যদের ক্ষতি ডেকে আনে, যেমন, প্রাণঘাতি অস্ত্র, উত্তেজক পানীয়, বিষ, প্রাণীহত্যা ও প্রতারণা প্রভৃতি বাণিজ্য থেকে বিরত থাকা, এবং যা সম্মানজনক, অনিন্দ্য, নির্দোষ ও অন্যের জন্য ক্ষতিশূন্য তা দিয়ে জীবনযাপন করা। এখানে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধমতবাদ শক্তভাবে যেকোনও ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরোধিতা করে, সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ করে যে, অস্ত্র বা মারণাস্ত্র ব্যবসা শয়তানি এবং জীবনযাত্রা নির্বাহে অনৈতিক।

অষ্টাঙ্গিক মহাপথের এ তিনটি বিষয় (সঠিক বাক্য, সঠিক কর্ম, সঠিক জীবিকা) নৈতিক আচরণ গঠন করে। এটা অনুধাবণ করা উচিত যে, বৌদ্ধিক নৈতিক আচরণ সুখী ও সম্প্রীতিপূর্ণ জীবন বিকশিত করার জন্য ব্যক্তি ও সমাজের দিকে লক্ষ্যস্থির করে। এই নৈতিক আচরণ সকল পারমার্থিক সিদ্ধিলাভে অপরিহার্য ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। কোনও ধরনের পারমার্থিক উন্নতি এই নৈতিক ভিত্তি ছাড়া অসম্ভব।

তারপর আসে মানসিক শৃঙ্খলা, যাতে অষ্টাঙ্গিক মহাপথের অন্য তিনটি বিষয় সংযুক্ত : যথা, সঠিক প্রচেষ্টা, সঠিক স্মৃতি এবং সঠিক সমাধি (তালিকায় ৬,৭ ও ৮ নম্বর)।

সঠিক প্রচেষ্টা হচ্ছে—১. মনে মন্দ ও অমঙ্গলজনক অবস্থার উদয় প্রতিরোধ করতে, ২. মনে উদিত মন্দ ও অমঙ্গলজনক অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করতে, ৩. মনে উৎপন্ন না-হওয়া ভালো ও মঙ্গলজনক অবস্থা তৈরি করতে, উৎপন্ন হওয়ার কারণ হতে এবং ৪. বর্তমানে মনে উৎপন্ন হওয়া ভালো ও মঙ্গলজনক অবস্থার উন্নতি ও পরিপূর্ণতা আনতে—বলবান ইচ্ছা।

সঠিক স্মৃতি (সতর্কতা) হচ্ছে— ১. শারীরিক কার্যক্রমের বিষয়ে (কায়া) ২. সংবেদন বা অনুভূতির বিষয়ে (বেদনা) ৩. মনের ক্রিয়ার বিষয়ে (চিত্ত) ৪. ভাব, ধারণা, চিন্তা এবং বস্তুর বিষয়ে (ধম্ম) অধ্যবসায়ের সঙ্গে সচেতন, মনোযোগী এবং সতর্ক হওয়া।

মানসিক উন্নতির জন্য দেহের সঙ্গে সম্পৃক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি একাগ্রতার অনুশীলন (আনাপানসতি) হচ্ছে অন্যতম একটি সুপরিচিত অনুশীলন-পদ্ধতি। ধ্যানের ধরন হিসেবে দেহের সঙ্গে সম্পৃক্ত একাগ্রতা বৃদ্ধির আরও অনেক পন্থা আছে।

বেদনার প্রতি পূর্ণ সচেতনতায় সকল প্রকার বেদনা—সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষা কীভাবে নিজের মধ্যে উদয়-বিলয় হয় তা পরিষ্কারভাবে জানা উচিত। মন কামনাপূর্ণ কি না, হিংসায় পতিত কি না, বিভ্রান্ত কি না, বিক্ষিপ্ত না একাগ্র, প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে সচেতন থাকা উচিত। এভাবে, মনের গতি-প্রকৃতি এবং কীভাবে সেগুলোর উদয়-বিলয় হয় তাতে সচেতন থাকা উচিত।

ভাবনা, চিন্তা, ধারণা ও বস্তুসমূহের বিষয় হিসেবে, সেগুলোর প্রকৃতি, কীভাবে সেগুলো উদয়-বিলয় হয়, কীভাবে সেগুলো উন্নত হয়, কীভাবে সেগুলো বুদ্ধ, ধ্বংস প্রভৃতি হয় তা জানা উচিত।

সতিপট্ঠান-সুত্ততে (মনোযোগ স্থাপন)[৩৭] এই চার ঘরনার মনোসংস্কৃতি বা ধ্যানের কথা বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে। মানসিক শৃঙ্খলার তৃতীয় ও শেষ বিষয় হচ্ছে—ধ্যানের চারস্তরগামী সঠিক একাগ্রতা, যেটাকে সাধারণত বলা হয় সমাধি। ধ্যানের প্রথম স্তরে কামবাসনা, লিপ্সার মতো অমঙ্গলচিন্তা, অশুভ ইচ্ছা, অবসন্নতা, দুশ্চিন্তা, চঞ্চলতা, এবং সন্দিগ্ধচিত্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং মানসিক

---

৩৭. ধ্যানের অধ্যায় দেখুন

ক্রিয়ায় আনন্দ ও সুখানুভূতি হয়। দ্বিতীয় স্তরে, সকল বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়াকলাপ নিবারিত হয়। প্রশান্তি ও মনের উৎকর্ষসাধনের একমুখিতা এবং আনন্দ ও সুখের অনুভূতি অব্যাহত থাকে। তৃতীয় স্তরে সক্রিয় সংবেদন আনন্দের অনুভূতিও বিলোপ হয়, মানসিক প্রশান্তির সঙ্গে সুখের বিন্যাস অব্যাহত থাকে। ধ্যানের চতুর্থ স্তরে সুখের, সুখহীনতার এমনকী আনন্দ-বিষাদের সমস্ত সংবেদন বিলুপ্ত হয়, শুধু বিশুদ্ধ প্রশান্তি এবং সচেতনতা বিদ্যমান থাকে।

এভাবে সঠিক প্রচেষ্টা, সঠিক স্মৃতি এবং সঠিক সমাধির মধ্য দিয়ে মন শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং উন্নত হয়।

বাকি দুটি দিক হলো প্রজ্ঞা উৎপন্ন করার সঠিক সংকল্প ও সঠিক দৃষ্টি।

সঠিক সংকল্প আত্মহীন ত্যাগ বা নির্বিকারত্ব, ভালোবাসা ও অহিংস চিন্তার নির্দেশ করে যা সমস্ত সত্তার প্রতি প্রসারিত। খুব চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আত্মবিহীন নিরাসক্তি, ভালোবাসা ও অহিংসার ভাবনা প্রজ্ঞার দিকে দলবদ্ধ। এটা পরিষ্কারভাবে বোঝায় যে, সত্যিকারের প্রজ্ঞা এই সকল মহৎ গুণাবলিতে বিভূষিত; এবং স্বার্থপর কামনা, অশুভ ইচ্ছা, ঘৃণা ও সংঘাত হচ্ছে ব্যক্তিগত, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক জীবনের সকল স্তরের প্রজ্ঞাহীনতার ফসল।

সঠিক উপলব্ধি হচ্ছে—বিষয় সম্পর্কে যথযথ উপলব্ধি এবং চার মহাসত্যই বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করে তা বোঝা। অতএব চার মহাসত্য অবগত হয়ে গেলে, অনিবার্যভাবে সঠিক সংকল্প উপলব্ধির পথ সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এ উপলব্ধিই হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা যা সর্বোচ্চ বাস্তবতা দর্শন করে।

বুদ্ধমতবাদ অনুযায়ী দুই ধরনের সঠিক উপলব্ধি আছে : যাকে আমরা সাধারণত বলি বুঝতে পারা—জ্ঞান, একটি পুঞ্জীভূত স্মৃতি, কোনও বিষয়ে প্রদত্ত নিশ্চিত তথ্য অনুযায়ী একটা বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধি। একে বলা হয় 'যথাযথভাবে জানা' (অনুবোধ), যা তেমন গভীর নয়। প্রকৃত গভীর অনুধাবনকে বলা হয় 'ভেদন' (পটিবেধ), নাম ও তকমা ছাড়া বস্তুর সত্যপ্রকৃতি দেখা। এই ভেদন তখনই সম্ভব যখন মন সম্পূর্ণ কলুষতামুক্ত থাকে ও পূর্ণভাবে ধ্যানের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়।[৩৮]

মহাপথের এই সংক্ষিপ্ত বয়ান থেকে, প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য দ্বারা, যে-কেউ তা নিজের জীবনে অনুসরণযোগ্য, অনুশীলনযোগ্য ও উৎকর্ষসাধনযোগ্য হিসেবে

---

৩৮. বিশুদ্ধিমার্গ (PTS), পৃ. ৫১০

দেখতে পারেন। তা শরীর-বাক্য-মনের আত্মশৃঙ্খলা, আত্মোন্নতি এবং আত্মশুদ্ধির। বিশ্বাস, প্রার্থনা, পূজা অথবা উৎসব দিয়ে এতে কিছুই করার নেই। সেই বিবেচনায় লোকপ্রিয়ভাবে এটাকে ধর্মীয় বলার মতো কিছুই নেই। এটা সেই পথ যা নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্ণতার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত বাস্তবতা অনুধাবনের দিকে, পূর্ণ স্বাধীনতা, সুখ ও শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

বুদ্ধমতাবলম্বী দেশসমূহে ধর্মীয় উৎসবে সহজ এবং সুন্দর প্রথা ও অনুষ্ঠান রয়েছে। সত্যিকারের পথে এগুলো দিয়ে কিছু করার যৎসামান্য সুযোগ রয়েছে। যারা কম অগ্রসর তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় আবেগ মিটাতে সেগুলোর মূল্য আছে এবং তাদেরকে ধীরে ধীরে এই পথে নিয়ে আসার জন্য সেগুলোর প্রয়োজন আছে।

চার মহাসত্য অনুযায়ী আমাদের চার ধরনের ক্রিয়াকর্ম—

প্রথম মহাসত্য হচ্ছে দুক্খ—জীবনের বৈশিষ্ট্য, ভোগান্তি, দুঃখ-বেদনা, অপরিপূর্ণতা ও অসন্তুষ্টিসমূহ, অনিত্যতা ও দুঃখবেদনা এবং অবাস্তবতাসমূহ। এর জন্য আমাদের কাজ হচ্ছে একে কারণ হিসেবে পরিষ্কার ও পূর্ণভাবে বোঝা (পরিঞ্ঞেয়্য)।

দ্বিতীয় মহাসত্য হচ্ছে দুক্খের উদয়—আকাঙ্ক্ষা, অন্যসকল আসক্তি দ্বারা সহগামী 'তৃষ্ণা', কলুষতা ও অশুদ্ধতা। এই বিষয়ে বিশুদ্ধ উপলব্ধিই যথেষ্ট নয়। এখানে আমাদের কাজ হচ্ছে এটাকে পরিত্যাগ করা, উচ্ছেদ করা, ধ্বংস করা এবং সমূলে উৎপাটন করা (পহাতব্ব)।

তৃতীয় মহাসত্য হচ্ছে দুক্খের নিরোধ—নির্বাণ, পরিপূর্ণ সত্য, চূড়ান্ত বাস্তবতা। এখানে আমাদের ক্রিয়া হচ্ছে এটাকে উপলব্ধি করা (সচ্চিকাতব্ব)।

চতুর্থ মহাসত্য হচ্ছে নির্বাণগামী পথের উপলব্ধি। এই পথের বিশুদ্ধ জ্ঞান, যাই হোক পরিপূর্ণ, কাজ করবে না। এই ক্ষেত্রে আমাদের কাজ হলো তা অনুসরণ করা এবং তা বহমান রাখা (ভাবেতব্ব)।[৩৯]

---

৩৯. মহাবগ্গ (অলুৎগম, ১৯২২), পৃ. ১০

ধ্যান বা মানসিক কর্ষণ : ভাবনা

বুদ্ধ বলেছেন, 'হে ভিক্ষুগণ, দুই ধরনের অসুস্থতা রয়েছে। দুইটি কী কী?—শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক অসুস্থতা। মানুষ শারীরিক অসুস্থতা থেকে বছর-দুই-বছর এমনকী শত বছরের অধিক মুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, যারা মানসিক কলুষতা থেকে মুক্ত (যেমন অর্হৎগণ) তারা ব্যতীত মানসিক রোগ থেকে মুক্ত মানুষ এই পৃথিবীতে দুর্লভ।'[৪০]

বুদ্ধের শিক্ষার, বিশেষত তাঁর ধ্যানের পথের, উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্যের একটি পর্যায়, সাম্যাবস্থা ও প্রশান্তি উৎপন্ন করা। দুর্ভাগ্য যে বুদ্ধশিক্ষার অন্য দিকের মতোই 'ধ্যান' বুদ্ধমতাবলম্বী ও অবুদ্ধমতাবলম্বী উভয়ের কাছে ভুলভাবে গৃহীত হয়। উল্লিখিত 'ধ্যান' শব্দটির গুরুত্ব বলতে তারা ভাবেন, জীবনের প্রাত্যহিক কর্ম হতে পলায়ন, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন স্থানে মন্দির-প্রকোষ্টে বা গুহার ভিতরে মূর্তির মতো বিশেষ অবস্থান গ্রহণ, এবং কিছু মরমি চিন্তা অথবা নিগূঢ় ভাবনা অথবা সম্মোহে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকা বা আকৃষ্ট হওয়া। প্রকৃত বৌদ্ধিক 'ধ্যান' মোটেও এই ধরনের পলায়ন বোঝায় না। এই বিষয়ে বুদ্ধের শিক্ষা এতো ভুলভাবে বা অল্প জ্ঞাত হওয়া গেছে যে পরবর্তী সময়ে 'ধ্যানের' পথ এক ধরনের ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠানে অনেকাংশে এর নিত্যকর্মে প্রায়োগিকভাবে অর্থহীন ও অধঃপতিত হয়ে যায়।[৪১]

অনেক লোক তৃতীয় চক্ষুর মতো আধ্যাত্মিক বা মরমি শক্তি যা অন্যদের অধিকারে নেই তা পেতে ধ্যান বা যোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিছুদিন পূর্বে ভারতে একজন

---

৪০. অঙ্গুত্তর-নিকায় (কলম্বো,১৯২৯), পৃ.২৭৬।

৪১. *দি যোগাবচারর্স ম্যানুয়াল (রিস ডেভিডস্ সম্পাদিত, ১৮৯৬)*, ধ্যানের ওপর লঙ্কায় সম্ভবত ১৮ শতকের দিকে লিখিত একটি গ্রন্থ, দেখায় কীভাবে ধ্যান সেই সময় মন্ত্রপাঠ, মোমবাতি প্রজ্জ্বলন প্রভৃতির মতো রীতিতে গিয়ে পতিত হয়। ওয়ালপোলা রাহুলকর্তৃক লিখিত *হিস্টরি অব বুড্ডিজম ইন সিলন* (কলম্বো,১৯৫৬), পৃ.১৯৯-এ সন্ন্যাস-আদর্শের ওপর দ্বাদশ অধ্যায়টিও দেখুন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী, সমর্থ-দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, কান দিয়ে দেখতে শক্তিবর্ধনের চেষ্টা করছিলেন। এই ধরনের ধারণা 'পারমার্থিক বিপথগমন' ছাড়া আর কিছু নয়। এটা সব সময়ই শক্তির আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণার প্রশ্ন।

প্রকৃত 'ভাবনা' বোঝাতে ধ্যান শব্দটি যৎসামান্য প্রতিকল্প—যার মানে 'কর্ষণ' বা 'উৎকর্ষ', যেমন মানসিক কর্ষণ বা মানসিক উৎকর্ষ। যথাযথভাবে পূর্ণ সংবেদনে বলতে গেলে বৌদ্ধিক ভাবনা হচ্ছে মানসিক কর্ষণ। এর উদ্দেশ্য মনের কামনাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা, অশুভ ইচ্ছা, আলস্য, দুশ্চিন্তা, চঞ্চলতা ও সন্দেহের মতো কলুষতা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করা এবং একাগ্রতা, সচেতনতা, বুদ্ধিমত্তা, ইচ্ছাশক্তি, বিশ্লেষণমূলক মনোবৃত্তি, সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা যা বস্তুর যথাযথ প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করে ও চূড়ান্ত সত্য নির্বাণ উপলব্ধি করে এমন গুণাবলির উৎকর্ষসাধন।

দুই ধরনের ধ্যান আছে। একটা হচ্ছে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি (সমথ বা সমাধি), মনের একবিন্দুমুখীতায় (চিত্তেকগ্গতা, সংস্কৃত চিত্তৈকাগ্রতা), গ্রন্থে বর্ণিত বিভিন্ন পন্থানুযায়ী এককেন্দ্রিক সর্বোচ্চ গূঢ় অবস্থায় নিয়ে যাওয়া, যেমন 'অনস্তিত্বের স্তর' বা (না-সংবেদন না-সংবেদনহীনতা)। এই সমস্ত রহস্যময় স্তর, বুদ্ধের মতে, মনের তৈরি, মনে উৎপন্ন, শর্তসাপেক্ষ (সঙ্খত)। বাস্তবতা, সত্য ও নির্বাণের বেলায় এগুলোর কিছুই করার নেই। এই ধরনের ধ্যান বুদ্ধের পূর্বে ছিল। এই কারণে এগুলো বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক নয়। যা হোক, এগুলো নির্বাণ উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়। বুদ্ধ তাঁর বোধিলাভের পূর্বে, বিভিন্ন শিক্ষকের অধীনে এই সমস্ত যোগাভ্যাস অনুশীলন করেছিলেন, এবং সর্বোচ্চ নিগূঢ় স্তর লাভ করেছিলেন; কিন্তু তিনি সেগুলোতে সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ সেগুলো সম্পূর্ণ মুক্তি দেয় না, অন্তরে চূড়ান্ত বাস্তবতা দেয় না। তিনি এই নিগূঢ় স্তরগুলোকে 'এই অস্তিত্বে সুখবাস' (দিট্‌ঠধম্মসুখবিহার), বা 'শান্তিপূর্ণ বসবাস' (সন্তবিহার) ছাড়া বেশি কিছু নয় বলে বিবেচনা করেছিলেন।[৪২]

ফলে তিনি, বস্তুর অভ্যন্তরের প্রকৃতি, মনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতাগামী চূড়ান্ত সত্য, নির্বাণ উপলব্ধি করতে বিপস্সনা (সংস্কৃতে বিপস্যনা বা বিদর্শন) নামক আরেক ধরনের ধ্যান আবিষ্কার করেছিলেন। এটাই মূলত বৌদ্ধিক 'ধ্যান', বৌদ্ধিক মানসিক উৎকর্ষসাধন। এই বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি মনোযোগিতা, সচেতনতা, জাগ্রদাবস্থা ও পর্যবেক্ষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একটা বিশাল বিষয় নিয়ে সামান্য কয়েক পাতায় বিচার-বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য। যাহোক, প্রকৃত বৌদ্ধিক 'ধ্যান', মানসিক কর্ষণ বা উৎকর্ষের বাস্তবিক পথে একটি খুব সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটি ধারণা

---

৪২. সল্লেখ-সুত্ত (৮ নং), মজ্ঝিম-নিকায়

এখানে দেওয়া হলো। বুদ্ধকর্তৃক মানসিক কর্ষণের (ধ্যান) ওপর প্রদত্ত ধর্মোপদেশকে বলা হয় সতিপট্ঠান-সুত্ত 'মনোযোগিতা-স্থাপন' (দীঘ-নিকায়ের ২২ নম্বর বা মজ্ঝিম-নিকায়ের ১০ নম্বর)। এই ধর্মোপদেশ প্রথানুযায়ী এত উচ্চভাবে পূজিত যে এটা নিয়মিত শুধু বৌদ্ধ বিহারে আবৃত্তি হয় না, বৌদ্ধগৃহেও পরিবার-পরিজন নিয়ে গোল করে বসে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আবৃত্তি ও শ্রবণ করা হয়। প্রায়শই ভিক্ষুগণ মৃত্যুপথযাত্রীদের শয্যাপার্শ্বে, তাঁর শেষ ভাবনা বিশুদ্ধ করতে, এই সুত্ত পাঠ করেন।

এই ধর্মোপদেশে দেওয়া ধ্যানের পন্থা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয় বা জীবনকে এড়িয়ে যাওয়ার নয়। অপরপক্ষে, সেগুলো সবকটি আমাদের জীবন, আমাদের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডসমূহ, আমাদের আনন্দ-বেদনাসমূহ, আমাদের ভাবনাসমূহ, আমাদের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত।

ধর্মোপদেশটি মূল চারভাগে বিভক্ত—প্রথম ভাগ শরীর (কায়া) নিয়ে আলোচনা করে, দ্বিতীয় ভাগ আমাদের সংবেদন ও বোধ (বেদনা) নিয়ে, তৃতীয় ভাগ মন (চিত্ত) নিয়ে এবং চতুর্থ ভাগ বিভিন্ন নীতিমূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় (ধম্ম) নিয়ে আলোকপাত করে।

মনে পরিষ্কারভাবে উৎপন্ন হওয়া উচিত যে, ধ্যান যেকোনও ধরনেরই হোক না কেন, প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে মনোযোগিতা বা সচেতনতা (সতি) ও সতর্কতা বা পর্যবেক্ষণ (অনুপস্সনা)। ধ্যানের একটি সুপরিচিত, জনপ্রিয় এবং বাস্তবিক উদাহরণ হচ্ছে, দেহের সঙ্গে সংযুক্ত, বলা হয় 'শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি মনোযোগিতা বা সচেতনতা' (আনাপানসতি)। এটি শুধু এ ধ্যানের জন্য, গ্রন্থে বর্ণিত, বিশেষ ও নির্দিষ্ট একটি ভঙ্গিমা। এই সুত্তে দেওয়া অন্য ধরনের ধ্যানের ক্ষেত্রে আপনার ইচ্ছামতো আপনি, বসে, দাঁড়িয়ে, হেঁটে বা শোয়ে করতে পারেন। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসে মনোযোগিতার কর্ষণের জন্য, গ্রন্থানুসারে, 'আসন করে, দেহ ঋজু রেখে এবং মনোযোগী সতর্কবস্থায়' বসতে হবে। কিন্তু আসন করে বসা সকল দেশের মানুষের জন্য, বিশেষ করে পশ্চিমাদের জন্য, বাস্তবিক ও সহজ নয়। অতএব, যারা আসন করে বসতে অসুবিধার সম্মুখীন হন, তারা চেয়ারে 'দেহ ঋজু রেখে এবং সতর্ক মনোযোগিতায়' বসতে পারেন। এই অনুশীলনের জন্য ধ্যানীকে অবশ্যই ঋজু হয়ে বসাটা অত্যন্ত জরুরি, কিন্তু অনমনীয় হয়ে নয়; তার হাত দুটি আরামের সঙ্গে কোলের ওপর রাখতে হয়। এইভাবে বসে, আপনি চোখ বন্ধ করতে পারেন বা নাসাগ্রে একদৃষ্টিতে তাকাতে পারেন, যেটা আপনার কাছে সুবিধাজনক মনে হয়।

আপনি সারা দিনরাত শ্বাস-প্রশ্বাস নেন, কিন্তু কখনওই এতে মনোযোগী নন। আপনি এক সেকেন্ডের জন্যও মনোযোগী হন না। এখন আপনি এটা করতে যাচ্ছেন মাত্র। স্বাভাবিকভাবে, কোনও ধরনের চাপ অনুভব না-করে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন। এখন মনকে শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর নিয়ে আসুন; মনকে আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যবেক্ষণ করতে দিন; আপনার মন শ্বাস-প্রশ্বাসে সচেতন ও সজাগ হোক। যখন আপনি শ্বাস নেন, মাঝে মাঝে গভীর শ্বাস নেন, মাঝে মাঝে নেন না। এটা মোটেও কোনও বিষয় না। স্বাভাবিকভাবে ও প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস নিন। শুধু একটা বিষয় যে আপনি যখন গভীর শ্বাস নেন তখন আপনার সচেতন থাকা উচিত যে, সেগুলো গভীর শ্বাস। অন্য অর্থে, আপনার মন শ্বাস-প্রশ্বাসে এত পূর্ণ মনোযোগী হওয়া উচিত যে, আপনি এর গতি-প্রকৃতি এবং পরিবর্তনে সজাগ। অন্য সবকিছু, আপনার চারপাশ, আপনার পরিবেশ, ভুলে যান; দৃষ্টি তুলবেন না এবং কোনও কিছুর দিকে তাকাবেন না। এটা পাঁচ থেকে দশ মিনিট চেষ্টা করুন।

শুরুতে শ্বাস-প্রশ্বাসে আপনার মনের একাগ্রতা আনতে খুব কঠিন মনে হবে। আপনি বিস্মিত হবেন যে কী-করে আপনার মন দৌড়ে বেড়ায়। এক জায়গায় থাকে না। আপনি বিভিন্ন ব্যাপার ভাবতে থাকবেন। বাইরের শব্দ শুনবেন। নিরুৎসাহিত ও নিরাশ হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু যদি আপনি এটি দিনে দুবার করে একসঙ্গে পাঁচ-দশ মিনিট করে সকাল-বিকাল করতে থাকেন, ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে মনোযোগিতা পেতে থাকবেন। একটা নির্দিষ্ট সময় পর যখন আপনি আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসে পূর্ণ মনোযোগ দিবেন, সূক্ষ্ম মুহূর্তের অভিজ্ঞতা পাবেন, তখন আপনি আশপাশের শব্দ শুনতে পাবেন না, আপনার কাছে বাহ্যিক কোনও পৃথিবী থাকবে না। এই সামান্য সময়, আপনার জন্য এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা, আনন্দ, সুখ এবং শান্ততায় পরিপূর্ণ লাগবে যে, তা আপনি অব্যাহত রাখতে চাইবেন। কিন্তু তারপরও আপনি পারবেন না। এ-পর্যন্ত আপনি আপনার অনুশীলন যদি নিয়মিত চালিয়ে যান, দীর্ঘ সময় ধরে বার বার আপনি আপনার অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। সেটাই গুরুত্বপূর্ণ যখন আপনাকে আপনি নিজ শ্বাস-প্রশ্বাসের মনোযোগিতায় হারিয়ে ফেলবেন। আপনি নিজের প্রতি সচেতন থাকলে কখনওই কোনও কিছুতে একাগ্র হতে পারবেন না।

এই শ্বাস-প্রশ্বাসের মনোযোগিতার সরল ও সহজতর অনুশীলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে একাগ্রতার উন্নতি করে উচ্চতর গূঢ় সিদ্ধিলাভের (ধ্যান) দিকে নিয়ে যাওয়া। এছাড়াও একাগ্রতার শক্তি যেকোনও ধরনের গভীর উপলব্ধি, বস্তুর প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ, নির্বাণ উপলব্ধিসহ যেকোনও ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়।

এসবকিছু ছেড়ে দিলেও শ্বাস-প্রশ্বাসের এই অনুশীলন আপনাকে প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করে। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য, আরামের জন্য, গভীর ঘুমের জন্য, এবং নিত্যকর্মের দক্ষতার জন্যও উপকারী। এমনকী ঘাবড়ে যাওয়া ও উত্তেজনার মুহূর্তে, যদি আপনি এটা কয়েক মিনিট অনুশীলন করেন দেখবেন দ্রুতই আপনি শান্ত এবং শান্তিতে স্থিত হয়েছেন। আপনি অনুভব করবেন যেন ভালো বিশ্রামের পর জেগে উঠেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে, জনজীবনে, কর্মজীবনে প্রাত্যহিক নিত্যকর্মের সময় আপনি শারীরিক বা বাচনিকভাবে যাই করেন না কেন তাতে সচেতন ও মনোযোগী হওয়া হচ্ছে ধ্যানের (মানসিক উৎকর্ষ) একটি গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তবিক ও কার্যকারী ধরন। আপনি হাঁটায় থাকুন, দাঁড়ানো থাকুন, বসে থাকুন, শোয়া থাকুন অথবা ঘুমিয়ে থাকুন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঙ্কোচন বা প্রসারণ করুন, যেকোনও দিকে তাকান, কাপড় পরিধান করুন, কথা বলুন অথবা নীরব থাকুন, খাওয়াদাওয়া বা পান করায় থাকুন, এমনকী প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিয়ে থাকুন তাতে আপনাকে পূর্ণ সচেতন ও মনোযোগী থাকা উচিত। আপনি যে মুহূর্তে যে কাজ করছেন, তা বলা যায়, এর মানে বর্তমান-কর্মে বাস করতে হবে। এর মানে এই নয় যে, আপনি অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে মোটেও ভাবতে পারবেন না। বরং যখন যেখানে যেগুলো প্রাসঙ্গিক সেখানে সেভাবে বর্তমান মুহূর্তে ও বর্তমান কর্মের সহায়তায় তা করতে হবে।

মানুষ সাধারণত তাদের কর্মে বর্তমান মুহূর্তে বাস করে না। তারা অতীত বা ভবিষ্যতে বাস করে। যদিও মনে হয় তারা এখানে কিছু করছে, তারা অন্য কোথাও, তাদের ভাবনায়, তারা তাদের কাল্পনিক সমস্যাসমূহে এবং দুশ্চিন্তায়, সচরাচর তারা অতীতের স্মৃতিতে অথবা তাদের ভবিষ্যতের কামনায় বা অনুধ্যানে অবস্থান করে। সুতরাং তারা এ মুহূর্তে যা করছে, তাতে তারা বাস করছে না, উপভোগও করছে না। তাই তারা বর্তমান মুহূর্তে তাদের হাতের কাজে অসুখী ও অসন্তুষ্ট এবং ফলে তারা নিজেদের সম্পূর্ণরূপে যা করতে চায় তাতে নিবিষ্ট করতে পারে না।

মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁয় আপনি কোনও ব্যক্তিকে পড়তে পড়তে খেতে দেখে থাকতে পারেন—যা সচরাচর দৃশ্যমান। তিনি আপনাকে এমন এক ব্যস্ত মানুষের ধারণা দেন– যার খাওয়ার সময় পর্যন্ত নেই। আপনি বিস্মিত হবেন যে, তিনি খাচ্ছেন নাকি পড়ছেন! কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন তিনি দুটোই করছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুই করছেন না, উপভোগ করছেন না। তিনি পীড়িত, মানসিকভাবে বিরক্ত, এবং তিনি যে মুহূর্তে যা করেন তা উপভোগ করেন না, তিনি তাঁর জীবনের বর্তমান মুহূর্তে বাস করেন না, কিন্তু অসচেতনভাবে জীবন

থেকে পালিয়ে বেড়াতে চেষ্টা করেন। (এর মানে এটা বোঝায় না যে, আপনার বন্ধুর সঙ্গে দুপুর বা রাতের খাবার গ্রহণের সময় কথা বলা অনুচিত)। আপনি জীবন থেকে পালিয়ে যেতে পারেন না, তবে আপনি চেষ্টা করতে পারেন। যতদিন বাঁচবেন শহরে বা গুহার ভিতরে যেখানে হোক না কেন আপনাকে তা মোকাবিলা করতে হবে এবং যাপন করতে হবে। প্রকৃত জীবন হচ্ছে বর্তমান মুহূর্ত—অতীতের স্মৃতি নয় যা মৃত ও গত, ভবিষ্যতের স্বপ্ন নয় যার এখনও জন্ম হয়নি। যিনি বর্তমান জীবনে বাস করেন, তিনি প্রকৃত জীবনে বাস করেন এবং তিনিই সবচেয়ে সুখী।

যখন বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কেন তাঁর শিষ্যগণ সরল ও শান্ত জীবনযাপন করে, শুধু দিনে একবার আহার করেও এত সমুজ্জ্বল? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'তাঁরা অতীত নিয়ে অনুতাপ করেন না, তাঁরা ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন থাকেন না। তাঁরা বর্তমানে বসবাস করেন। তাই তাঁরা সমুজ্জ্বল। ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন থেকে এবং অতীতকে নিয়ে অনুতাপ করে বোকারা কাটা সবুজ শনের মতো শুকিয়ে যায় (সূর্যালোকে)।'[৪৩]

মনোযোগ বা জাগরণ মানে এই নয় যে 'আমি এটা করছি' বা 'আমি ওটা করছি। না, ঠিক উলটোটা। যে মুহূর্তে আপনি ভাবেন 'আমি এটা করছি', আপনি আত্মসচেতন হয়ে যান, তখন আপনি কর্মে অবস্থান করেন না। কিন্তু আপনি 'আমি' নামক ধারণায় বাস করেন এবং তার ফলে আপনার কাজও নষ্ট হয়ে যায়। আপনার নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া উচিত, আপনি যা করছেন তাতে আপনার হারিয়ে যাওয়া উচিত। যে মুহূর্তে বক্তা আত্মসচেতন হন এবং ভাবেন 'আমি জনসম্মুখে বক্তৃতা দিচ্ছি', তার বক্তৃতা বাধাগ্রস্ত হয় এবং চিন্তার প্রবাহ ভেঙে যায়। কিন্তু যখন তিনি তার বক্তব্যে, আলোচ্য বিষয়ে নিজে ডোবে যান তখন তিনি তার সর্বোত্তম পর্যায়ে থাকেন, তিনি ভালো বলেন ও বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেন। শৈল্পিক, কাব্যিক, বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা পারমার্থিক সকল মহৎ কর্ম সেই সব মুহূর্তেই সৃষ্টি হয় যখন সেগুলোর স্রষ্টাগণ তাদের কর্মে সম্পূর্ণ হারিয়ে যান, যখন তারা নিজেদের সম্পূর্ণরূপে ভুলে যান ও আত্মসচেতনতা থেকে মুক্ত হন।

আমাদের ক্রিয়াকর্মের জন্য এই মনোযোগিতা বা সতর্কতা হচ্ছে, বুদ্ধের দেওয়া শিক্ষায়, বর্তমান মুহূর্তে বাস করার, বর্তমান কর্মে বাস করার। (এটা জেন্ পন্থাও, যেটার এই শিক্ষার উপরেই ভিত্তি।) এই ধরনের ধ্যানে, মনোযোগিতার উৎকর্ষের নিমিত্তে আপনাকে কোনও বিশেষ কর্ম সম্পাদন করতে হবে না। কিন্তু আপনি যাই

---

৪৩. সংযুক্ত-নিকায়-I (PTS), পৃ. ৫

করেন না কেন শুধু তাতেই মনোযোগী ও সতর্ক হতে হবে। আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় থেকে এক সেকেন্ড সময় এই বিশেষ ধ্যানে ব্যয় করতে হবে না : আপনাকে সব সময়, দিনে এবং রাতে, জীবনের সকল সচরাচর নিয়মিত কর্ম সম্বন্ধে মনোযোগিতা ও সতর্কতা কর্ষণ করতে হবে। উপরে আলোচিত এ দুই ধরনের ধ্যান আমাদের শরীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

তারপর আমাদের সকল সংবেদন ও অনুভূতির জন্য, সুখ-দুঃখ-উপেক্ষা যাই হোক না কেন, মানসিক উৎকর্ষ সাধনের (ধ্যান) পথ রয়েছে। চলুন আমরা শুধু একটি উদাহরণ নিই। যখন আপনি একটি অসুখী দুঃখপূর্ণ সংবেদনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন তখন এই অবস্থায় আপনার মন অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিহ্বল, অপরিষ্কার ও বিষণ্ন। কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে আপনি বোঝেন না যে কেন আপনার অসুখী অনুভূতি হচ্ছে। সর্বপ্রথম আপনাকে অসুখী অনুভূতি সম্পর্কে অসুখী না-হওয়া শিখতে হবে, দুশ্চিন্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা না-করা শিখতে হবে। আপনাকে পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করতে হবে যে, কেন এই সুখহীনতা বা দুশ্চিন্তা বা দুঃখ। কীভাবে এর উদয়, এর কারণ কী, কীভাবে এর বিলয় হয়, এর নিরোধ কী—তা অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করুন। একজন বিজ্ঞানী যেভাবে কোনও বস্তু পর্যবেক্ষণ করেন, কোনও আত্মিক প্রতিক্রিয়া ছাড়া, তেমনভাবে বাহির থেকে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তা অনুসন্ধান করুন। এখানেও 'আমার অনুভূতি' 'আমার সংবেদন' হিসেবে আত্মিকভাবে আপনার দেখা উচিত নয়। কিন্তু জ্ঞায় বিষয় হিসেবে শুধু 'একটি বেদনা' বা 'একটি সংবেদন' হিসেবে দেখা উচিত। 'আমি'এর মিথ্যা ধারণা ভুলে যাওয়াই কর্তব্য। যখন আপনি এটির প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করবেন, কীভাবে উদয়-বিলয় হয়, আপনার মনে সংবেদনের প্রতি পক্ষপাতহীনতা জন্মাবে এবং তা নির্লিপ্ত ও মুক্ত হবে। সকল প্রকারের সংবেদনের জন্য এটা সমান।

চলুন এখন মনের জন্য ধ্যানের ধরন নিয়ে আলোচনা করি। যখনই আপনার মন উত্তেজিত বা নির্লিপ্ত, যখনই ঘৃণা, অশুভ ইচ্ছা ও ঈর্ষা অথবা পূর্ণ ভালোবাসা ও দয়ায় বশীভূত, যখনই তা ভ্রান্ত অথবা পরিচ্ছন্ন ও সঠিক উপলব্ধির অধিকারী এবং প্রভৃতিতে থাকে তখন আপনাকে অবশ্যই সেই সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ সচেতন থাকা উচিত। আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে প্রায়শই আমরা নিজেদের মনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে ভীত ও লজ্জিত হই। তাই আমরা তা এড়িয়ে যেতে পছন্দ করি। নিজেকে সাহসী ও অকপট হতে হবে এবং নিজের মনের দিকে অবলোকন করতে হবে এমনভাবে যেন নিজের মুখশ্রী আয়নায় দেখছি।[৪৪]

---

৪৪. মজ্ঝিম-নিকায়-I(PTS), পৃ. ১০০

এখানে, সঠিক ও ভুল অথবা ভালো ও মন্দের মধ্যে সমালোচনামূলক বা বিচারমূলক বা পৃথককারক কোনও মনোভাব নেই। এটা কেবল পর্যবেক্ষণ, প্রত্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ। আপনি একজন বিচারক নন, কিন্তু আপনি একজন বিজ্ঞানী। যখন নিজের মনকে পর্যবেক্ষণ করবেন, এবং এর প্রকৃতি পরিষ্কারভাবে বুঝবেন, তখন এর আবেগগুলো, অনুভূতিগুলো ও অবস্থানসমূহ সম্বন্ধে আপনি পক্ষপাতহীন হয়ে যাবেন। এরূপে আপনি নির্লিপ্ত ও মুক্ত হয়ে যান যাতে করে বিষয়সমূহের স্বরূপ যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

চলুন আমরা একটা উদাহরণ নিই। ধরুন, আপনি সত্যিই রাগান্বিত, ক্রোধ, অশুভ ইচ্ছা ও ঘৃণাদ্বারা বশীভূত। এটা অদ্ভুত ও আপাতবিরোধী সত্য যে, যে-লোকটি রাগে ডুবে আছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি জাগ্রত ও মনোযোগী নন বলেই রাগান্বিত। তার মনের অবস্থানে যখন তিনি সজাগ ও মনোযোগী হবেন, সে মুহূর্তে তিনি তার রাগ প্রত্যক্ষ করবেন যেন তা লজ্জার এবং তা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে। এর প্রকৃতি আপনার পরীক্ষা করা প্রয়োজন, কীভাবে এর উদয়-বিলয় হয়। এখানে আবারও এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, 'আমি রাগান্বিত' বা 'আমার রাগ' এমনটি ভাবা আপনার অনুচিত। আপনার মনের রাগান্বিত পর্যায়ে বরং সজাগ ও মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। আপনি শুধু জ্ঞায় বিষয় হিসেবে রাগান্বিত মন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করছেন। মনের সকল আবেগ, অনুভূতি এবং অবস্থানের ক্ষেত্রে এই মনোভাব থাকা উচিত।

তারপর, নৈতিক, পারমার্থিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ের ওপর ধ্যানের আরেকটি প্রণালি রয়েছে। এই রকম বিষয়ে আমাদের সকল অধ্যয়ন, পাঠ, বিতর্ক, কথোপকথন এবং আলোচনাসমূহ এই ধ্যানের অন্তর্ভুক্ত। এ বইটি পড়া এবং এতে আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা ধ্যানেরই একটি ধরন। আমরা পূর্বে দেখেছি যে খেমক ও সন্ন্যাসীসঙ্ঘের মধ্যে কথোপকথন ধ্যানেরই একটি পদ্ধতি ছিল যা নির্বাণ উপলব্ধির দিকে নিয়ে গেছে।

তাই এই ধ্যানের নিয়ম অনুযায়ী আপনি পঞ্চ-অন্তরায় (নীবরণ) নিয়ে অধ্যয়ন, চিন্তা ও বিচার-বিবেচনা করতে পারেন, যেমন—

১. ইন্দ্রিয়জাত কামনা-বাসনা (কামচ্ছন্দ)
২. অশুভ ইচ্ছা, ঘৃণা বা রাগ (ব্যাপাদ)
৩. অবসাদ ও আলস্য (থীন-মিদ্ধ)
৪. অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা (উদ্ধচ্চ-কুকুচ্চ)
৫. অবিশ্বাসী সন্দেহ (বিচিকিচ্ছা)

যেকোনও স্পষ্ট উপলব্ধির ক্ষেত্রে, এই পাঁচটি বিষয়, বাস্তবিকপক্ষে, যেকোনও প্রগতির ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত। যখন কেউ সেগুলো দ্বারা বশীভূত হন

এবং যখন সেগুলো থেকে মুক্তিলাভের উপায় কী তা জানেন না, তখন তিনি ঠিক-বেঠিক বা ভালো-মন্দ বুঝতে পারেন না।

কেউ চাইলে বোধিজ্ঞানের সাতটি অঙ্গ (বোজ্ঝঙ্গ) নিয়ে ধ্যান করতে পারেন। সেগুলো হলো—

১. **মনোযোগিতা (সতি) :** আমরা উপরে যেভাবে আলোচনা করেছি সেভাবে শরীর ও মন উভয়ের গতি-প্রকৃতি ও কর্মে সজাগ এবং মনোযোগী হওয়া।

২. **মতবাদের বিভিন্ন সমস্যাদির ওপর অনুসন্ধান ও গবেষণা (ধম্মবিচয়) :** আমাদের সকল ধর্মীয়, নৈতিক ও দার্শনিক অধ্যয়ন, পাঠ, গবেষণাসমূহ, কথোপকথনসমূহ, এমনকী এইরকম মতবাদ সম্পর্কীয় বক্তৃতাসভায় যোগদান সবকিছুই এখানে সম্পৃক্ত।

৩. **কর্মশক্তি (বীর্য) :** শেষ পর্যন্ত কাজ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

৪. **আনন্দ (পীতি) :** মনের নৈরাশ্যবাদী, অস্পষ্ট বা বিষাদগ্রস্ত ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীতের গুণ।

৫. **আরাম (পস্সদ্ধি) :** দেহ ও মনের আরাম। শারীরিক ও মানসিকভাবে অনমনীয় না-হওয়া উচিত।

৬. **একাগ্রতা (সমাধি) :** যেমন করে উপরে বর্ণিত হয়েছে।

৭. **মানসিক সাম্য (উপেক্খা) :** জীবনের সকল উত্থান-পতন শান্ত মনে, প্রশান্তির সঙ্গে, কোনও বাধা ছাড়া মোকাবিলা করতে সক্ষম হওয়া।

এই গুণগুলোর কর্ষণ করতে বিশুদ্ধ কামনা, ইচ্ছা বা অনুরাগ হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি বিষয়। প্রত্যেকটি গুণের উৎকর্ষসাধনের সহায়ক আরও অনেক বস্তুগত ও পারমার্থিক শর্ত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে।

'সত্তা কী?' বা 'কাকে আমি বলে?' প্রশ্নটির অনুসন্ধানে পঞ্চস্কন্ধ অথবা উপরে আলোচিত চার মহাসত্য নিয়ে কেউ ধ্যান করতে পারেন। ওই বিষয়সমূহে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান চতুর্থ ধ্যানের গঠন নির্মাণ করে, যা চূড়ান্ত সত্য উপলব্ধির দিকে পরিচালিত করে।

আমরা এখানে যা আলোচনা করেছি সেগুলো ছেড়ে দিলে আরও অনেক ধরনের ধ্যানের বিষয় রয়েছে, পরম্পরাগত চল্লিশটি, যেগুলোর মধ্যে চারটি উন্নত স্তরের কথা উল্লেখ করা যায়— ১. কোনও ধরনের বৈষম্য ব্যতিরেকে, 'একমাত্র সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার মতো' অসীম মহাজাগতিক ভালোবাসার সম্প্রসারণ

এবং সকল জীবন্ত সত্তার প্রতি শুভ-ইচ্ছা (মেত্তা); ২. যারা দুর্দশাগ্রস্ত, সমস্যায় পতিত এবং দুঃখে নিমজ্জিত সেই সকল জীবন্ত সত্ত্বার প্রতি দয়া (করুণা); ৩. অন্যের সাফল্য, মঙ্গল এবং সুখে সহানুভূতিসম্পন্ন আনন্দ (মুদিতা); ৪। জীবনের সকল উত্থান-পতনে মানসিক সাম্যতা (উপেক্খা)।

বুদ্ধের শিক্ষা ও আজকের বিশ্ব

কিছু লোক রয়েছেন যাদের বিশ্বাস, বুদ্ধমতবাদ এত উচ্চ ও মহান পদ্ধতি যে, তা আমাদের কর্মব্যস্ত পৃথিবীর স্বাভাবিক জীবন জগতে থেকে সাধারণ নরনারী দ্বারা অনুশীলন সম্ভবপর নয়, এবং যদি কেউ প্রকৃত বুদ্ধমতাবলম্বী হতে চায়, তা থেকে অবসর নিয়ে তাকে বিহারে বা কোনও নীরব জায়গায় চলে যেতে হবে।

সুস্পষ্ট বুদ্ধশিক্ষার উপলব্ধির অভাবেই এই ভুল ধারণার উৎপত্তি। বুদ্ধমতবাদ সম্পর্কে বিষয়টির সবদিক দিয়ে না-বোঝে, শুধু আংশিক ও একপেশে ব্যাখ্যা দেওয়া কারও কিছু শুনে বা অযত্নের সঙ্গে পাঠ করে মানুষ এমন দ্রুত ও ভুল উপসংহারে পৌঁছে যায়। বুদ্ধশিক্ষার অভিপ্রায় শুধু বিহারের সন্ন্যাসীদের জন্য নয়, পরিবার-পরিজন নিয়ে গৃহে বসবাসরত নরনারীদের জন্যও। অষ্টাঙ্গযুক্ত মহাপথ, যেটি জীবনের বৌদ্ধিক পন্থা, কোনও বিভেদ ব্যতিরেকে, সকলের জন্য সমান অর্থবাহী।

পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশাল জনগোষ্ঠী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতে পারবে না বা সবকিছু ছেড়ে অরণ্য বা গুহায় চলে যেতে পারবে না। যাই হোক, মহান ও বিশুদ্ধ বুদ্ধমতবাদ হয়ত বিশালসংখ্যক মানুষের কাছে অর্থহীন হয়ে যেত যদি তারা আজকের এই বিশ্বে তাদের দৈনন্দিন জীবনে তা অনুসরণ করতে না পারতেন। কিন্তু, যদি আপনি বুদ্ধমতবাদের চেতনা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন (শুধু আক্ষরিক অর্থে নয়), আপনি, নিশ্চিতভাবে, সাধারণ মানুষের জীবনযাপন করেও তা অনুসরণ ও অনুশীলন করতে পারবেন।

কিছু লোক থাকতে পারেন যারা বুদ্ধমতবাদ গ্রহণ করতে সহজতর ও অধিক সুবিধা খুঁজে পান যদি তাদের অন্যদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন দূরের কোনও জায়গায় বাস করতে দেওয়া হয়। অন্য অনেকেই এ ধরনের অবসরে শারীরিক ও মানসিক দুক্ষেত্রেই নীরসতা ও বিষণ্ণতা খুঁজে পাবেন এবং তা তাদের পারমার্থিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে সহায়ক হতে পারবে না।

প্রকৃত আত্মত্যাগ মানে শারীরিকভাবে জগৎ থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য সারিপুত্ত বলেছেন যে, কেউ অরণ্যে বসবাস করে নিজেকে সন্ন্যাসব্রতের অনুশীলনে নিবেদিত রেখেও, অবিশুদ্ধ ভাবনা ও কলুষতায় পরিপূর্ণ হতে পারেন; অপরপক্ষে কোনও সন্ন্যাসবিনয় না মেনেও শহরে বা গ্রামে বাসকরা কারও মন কলুষতামুক্ত ও বিশুদ্ধ হতে পারে। সারিপুত্ত বলেন, এ দুয়ের মধ্যে যিনি গ্রাম বা শহরে বাস করে বিশুদ্ধ জীবনযাপন করেন, তিনি অবশ্যই সেই অরণ্যবাসীর তুলনায় অনেক উন্নততর ও মহত্তর।[৪৫]

বুদ্ধশিক্ষা অনুসরণ করতে হলে জীবন থেকে অবসর নিতে হবে,—এমন প্রচলিত ধারণাটি ভুল। বুদ্ধশিক্ষা অনুশীলনে এটি একটি অসচেতন আক্রমণ। বৌদ্ধসাহিত্যে এমন অজস্র উদাহরণ আছে যে সাধারণ জীবনযাপন করে নরনারীগণ বুদ্ধশিক্ষা অনুশীলন করেছেন এবং নির্বাণ উপলব্ধি করেছেন। ভবঘুরে বচ্চগত্ত এটা বুদ্ধকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন যে, পারিবারিক জীবনে থেকেও উপাসক-উপাসিকাগণ তাঁর শিক্ষা সফলভাবে অনুসরণ করেছেন এবং উচ্চ পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করেছেন এমন নজির আছে কি-না। বুদ্ধ সুস্পষ্টভাবে উত্তর দিয়েছিলেন যে, একশত বা দুইশত নয় আরও অনেক বেশি উপাসক-উপাসিকা আছেন যারা পারিবারিক জীবনে থেকেও তাঁর শিক্ষা সফলতার সঙ্গে অনুশীলন করে সর্বোচ্চ পারমার্থিক সিদ্ধিলাভ করেছেন।[৪৬]

কিছু বিশেষ লোকের জন্য কোলাহল ও বিরক্তি থেকে নীরব জায়গায় বসবাস উপযুক্ত। কিন্তু আপনার সহচর সত্তাসমূহের মধ্যে থেকে, তাদের সাহায্য করে, তাদের সেবায় নিয়োজিত থেকে, বুদ্ধশিক্ষা অনুশীলন আরও প্রশংসনীয় ও সাহসী বিষয়। একজন মানুষের ক্ষেত্রে হয়ত, পরবর্তীকালে অন্যদের সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট শক্তিসঞ্চয় করতে, নিজের মন ও চরিত্রের উন্নতিসাধনের জন্য, প্রাথমিক রীতিনীতি, পারমার্থিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ হিসেবে একটা সময় অবসরযাপন উপকারী হতে পারে। কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি তার চারপাশের মানুষদের খেয়াল না-করে শুধু তার নিজস্ব সুখ ও মুক্তির চিন্তায় মগ্ন থেকে সারাটা জীবন নির্জন স্থানে কাটিয়ে দেন, তবে তা অবশ্যই, ভালোবাসা, সহানুভূতি ও পরসেবার ওপর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধশিক্ষায় নিয়োজিত থাকা নয়।

কেউ এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন : যদি একজন ব্যক্তি সাধারণ গৃহীর জীবনযাপন করে বুদ্ধমতবাদ অনুসরণ করতে পারেন, তাহলে বুদ্ধপ্রতিষ্ঠিত

---

৪৫. মজ্ঝিম-নিকায় ও.পৃষ্ঠা ৩০-৩১
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯০

সন্ন্যাসীদের সংগঠন, সঙ্ঘ, কেন? সঙ্ঘ তাঁদেরই জন্য যাঁরা নিজেদের পারমার্থিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষসাধনের জন্য শুধু নয়, অন্যের সেবায়ও নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে চান। একজন সাধারণ গৃহী তার পরিবার-পরিজন নিয়ে সম্পূর্ণ জীবন অন্যের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন তা প্রত্যাশা করা যায় না; যেহেতু একজন সন্ন্যাসীর কোনও পারিবারিক কোনও দায়দায়িত্ব বা সাংসারিক বন্ধন নেই, এই অবস্থায় তিনি তার সম্পূর্ণ জীবন বুদ্ধের উপদেশ অনুযায়ী 'বহুজনের সুখের জন্য, বহুজনের মঙ্গলের জন্য' উৎসর্গ করেন। এভাবেই ইতিহাসব্যাপী বৌদ্ধমঠ শুধু আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রও হয়ে উঠেছিল।

সিগাল-সুত্ত (৩১ নম্বর, দীঘ-নিকায়) দেখায় যে, বুদ্ধের বিবেচনায় গৃহীর জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কসমূহ কী উচ্চশ্রদ্ধা পেয়েছিল।

সিগাল নামক এক যুবক, প্রায়শই, স্বর্গসমূহের ছয়টি দিকে—(উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ঊর্ধ্ব, অধঃ)—তার মৃত্যুপথযাত্রী পিতার শেষ উপদেশ অনুযায়ী পূজা করতেন। বুদ্ধ তাকে বলেছিলেন 'শ্রেষ্ঠ-বিনয়'-এ (অরিয়সচ্চ বিনয়) ছয়দিক নিয়ে তাঁর শিক্ষা ভিন্ন। তাঁর শ্রেষ্ঠ-বিনয়অনুযায়ী ছয়টি দিক হলো—পূর্ব : পিতামাতা; দক্ষিণ : শিক্ষক; পশ্চিম : স্ত্রী-সন্তান; উত্তর : বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীগণ; অধঃ : ভৃত্য, কর্মচারী ও শ্রমিক; ঊর্ধ্ব : ধর্মীয় শিক্ষকগণ।

বুদ্ধ বলেছিলেন, 'এই ছয়টি দিকে পূজা করা উচিত'। এখানে 'পূজা' (নমস্সেয়) শব্দটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ পবিত্র কোনও কিছু, শ্রদ্ধা ও সম্মানযোগ্য কোনও কিছুই মানুষ পূজা করে। উল্লিখিত ছয়টি পারিবারিক বিষয়সমূহ বুদ্ধমতবাদে পবিত্র হিসেবে, শ্রদ্ধা ও সম্মানযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু কীভাবে তাদের পূজা করতে হয়? বুদ্ধ বলেন যে, তাদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই যে কেউ তাদের পূজা করতে পারেন। এই দায়িত্বগুলো সিগালের সঙ্গে ধর্মালোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রথম : পিতামাতা তাদের সন্তানের কাছে পবিত্র। বুদ্ধ বলেন, 'পিতামাতা ব্রহ্মা' (ব্রহ্মাতি মাতাপিতার)। 'ব্রহ্মা' আখ্যাটি ভারতীয় ভাবনায় সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে পবিত্র ধারণা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং বুদ্ধ এতে পিতামাতাকে যুক্ত করেন। তাই এই সময়ের উৎকৃষ্ট বুদ্ধমতাবলম্বী পরিবারে যথাযথভাবে পিতামাতাকে প্রত্যেকদিন সকাল-বিকাল 'পূজা' করেন। 'শ্রেষ্ঠ-বিনয়' অনুসারে তাদের পিতামাতার প্রতি তাদের কিছু বিশেষ কর্তব্য পালন করতে হয় : তাদেরকে তাদের পিতামাতার বার্ধক্যকালে দেখাশোনা করা কর্তব্য; তাদের জন্য যা যা করণীয় তা সম্পাদন কর্তব্য, পরিবারের সম্মানরক্ষা ও পারিবারিক ঐতিহ্য অব্যাহত রাখা কর্তব্য; পিতামাতার অর্জিত সম্পদ রক্ষা করা কর্তব্য; এবং তাদের মৃত্যুর পর

শেষকৃত্য অনুষ্ঠান পালন করা কর্তব্য। পিতামাতাদের, নিজের বেলায়, সন্তানদের প্রতি নির্দিষ্ট কিছু কর্তব্য রয়েছে : তাদের সন্তানদের মন্দকর্ম থেকে দূরে রাখা উচিত; উত্তম ও লাভজনক কাজে সম্পৃক্ত করানো উচিত; যথাযথ শিক্ষা প্রদান করা উচিত; ভালো পরিবারে বিয়ে দেওয়া উচিত; এবং যথাকালে তাদের কাছে সম্পদ হস্তান্তর করা উচিত।

দ্বিতীয় : ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক : শিক্ষকের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন এবং অনুগত থাকা একজন ছাত্রের কর্তব্য; যেকোনও প্রয়োজনে মনোযোগ দেওয়া উচিত; আন্তরিক প্রচেষ্টার সঙ্গে অধ্যয়ন করা উচিত এবং শিক্ষকের, নিজের বেলায়, তাঁর ছাত্রকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান ও গড়ে তোলা উচিত; ভালোভাবে শিক্ষাপ্রদান করা উচিত; তাকে তার বন্ধুদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত; এবং শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর তার সচেষ্টায় নিরাপত্তা বা চাকুরি পাওয়ার অনুপ্রেরণা প্রদান করা উচিত।

তৃতীয় : স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক : স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা অনেকাংশেই ধর্মীয় বা পবিত্র হিসেবে বিবেচিত, এটাকে 'সদার ব্রহ্মচরিয়া' পবিত্র পারিবারিক জীবন বলে ডাকা হয়। এখানেও ব্রহ্মা ব্যাপাটির তাৎপর্য খেয়াল করা উচিত : এই সম্পর্ককে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী, উভয়ের, পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত, শ্রদ্ধাপূর্ণ, অনুরক্ত থাকা উচিত এবং তাদের একের অন্যের প্রতি বিশেষ কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে : স্বামীর সবসময় স্ত্রীকে সম্মান করা উচিত এবং কখনই তাকে সম্মান করতে কার্পণ্য করা উচিত নয়; তাকে ভালোবাসা উচিত এবং তার নিকট বিশ্বস্ত থাকা উচিত; তার অবস্থান ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা উচিত; তাকে কাপড়চোপড়, গহনাপাতি উপহার দিয়ে আনন্দিত রাখা উচিত। (বিষয়টির মানে, বুদ্ধ উল্লেখ করতে ভোলেননি যে স্বামীর স্ত্রীকে উপহার প্রদানের মতো ব্যাপারে সাধারণ মানুষের প্রতি তার অনুকম্পাপূর্ণ অনুভূতি কতটুকু উপলব্ধিপূর্ণ ও সহানুভূতিপূর্ণ ছিল)। স্ত্রীর, তার নিজের বেলায়, গৃহস্থালির কল্যাণে তত্ত্বাবধানও দেখাশোনা করা উচিত; অতিথি, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও কর্মচারীদের আপ্যায়ন করা উচিত; সকল কর্মে চালাক ও উদ্যমী হওয়া উচিত।

চতুর্থ : বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক : তাদের একের অন্যের প্রতি অতিথিপরায়ণ ও উদার হওয়া উচিত; সন্তোষজনক ও প্রীতিকর কথা বলা উচিত; সবার প্রতি সমান হওয়া উচিত; নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা উচিত নয়; প্রয়োজনের সময় একে অন্যকে সাহায্য করা উচিত; বিপদের সময় ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়।

পঞ্চম : মালিক ও কর্মচারীর সম্পর্ক : মালিকের তার ভৃত্য বা কর্মচারীর প্রতি অনেক কর্তব্য আছে : সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ প্রদান করা : পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা; চিকিৎসাসেবা প্রদান করা ; উৎসবভাতা মঞ্জুর করা কর্তব্য; ভৃত্য বা কর্মচারী নিজেরবেলায় পরিশ্রমী এবং অলস না-হওয়া কর্তব্য; তার কাজে একনিষ্ঠ হওয়া উচিত।

ষষ্ঠ : ধর্মীয় ব্যাক্তি (যেমন : সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ) ও গৃহীদের সম্পর্ক : গৃহীদের উচিত ধর্মীয় ব্যক্তিদের বস্তুগত প্রয়োজন ভালোবাসা ও সম্মানের সঙ্গে দেখাশোনা করা। ধর্মীয় ব্যক্তিদের উচিত ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় দিয়ে জ্ঞান ও শিক্ষা গৃহীদের জ্ঞাত করা, এবং তাদের মন্দপথ থেকে দূরে সরিয়ে ভালো পথের দিকে যাওয়া।

আমরা তাহলে দেখি যে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কসহ গৃহীজীবন 'মহান বিনয়'-এর অন্তর্গত এবং জীবনের বৌদ্ধিক পন্থার কাঠামোর মধ্যে রয়েছে, যেভাবে বুদ্ধবিবেচনা করেছেন।

তাই, প্রাচীন পালি গ্রন্থ সংযুক্ত-নিকায়ে, সক্ক, দেবতাদের (দেব) রাজা ঘোষণা করেন, 'শুধু সন্ন্যাসীদের, যারা পবিত্র ধর্মীয় জীবনযাপন করেন, পূজা করো না, যারা ধার্মিক, সঠিকভাবে পারিবারিক জীবনযাপন করেন এবং প্রশংসনীয় কর্ম করেন, সেই গৃহীশিষ্যদেরও (উপাসক) পূজা করো।'[৪৭]

যদি কেউ বুদ্ধ মতাবলম্বী হতে আকাঙ্ক্ষা করেন, কোনও দীক্ষা-অনুষ্ঠান নেই যেটার অবলম্বন করতে হয়, (কিন্তু একজন ভিক্ষু হতে হলে, সঙ্ঘের সদস্য হতে হলে নিয়মকানুনের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষায় দীর্ঘ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়)। কেউ যদি বুদ্ধশিক্ষা বুঝতে পারেন, এবং যৌক্তিক প্রমাণের সঙ্গে অবগত হয় যে তাঁর শিক্ষা হচ্ছে সঠিক পথের, এবং তা অনুসরণ করতে যদি চেষ্টা করেন, তাহলে তিনিই বুদ্ধমতাবলম্বী। কিন্তু, বুদ্ধমতাবলম্বী দেশসমূহে, প্রাচীন অভগ্ন ঐতিহ্য অনুসারে একজন বুদ্ধমতাবলম্বী হিসেবে বিবেচিত হন যদি তিনি বুদ্ধ, ধম্ম (শিক্ষা) এবং সঙ্ঘের (সন্ন্যাসীদের সংগঠন) শরণ গ্রহণ করেন (সাধারণত একে 'ত্রিরত্ন' বলা হয়) এবং পঞ্চনীতি (পঞ্চশীল) : (১) জীবন ধ্বংস না করার (২) চুরি না করার (৩) ব্যাভিচার না করার (৪) মিথ্যা না বলার (৫) উত্তেজক পানীয় গ্রহণ না-করার শিক্ষা প্রাচীন গ্রন্থে প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী আবৃত্তি করেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ধর্মসভার সচরাচর বৌদ্ধসন্ন্যাসীর নেতৃত্ব অনুসরণ করে বুদ্ধমতাবলম্বীরা এই নীতিসমূহ আবৃত্তি করে থাকেন।

---

৪৭. সংযুক্ত-নিকায় ও (PTS) পৃষ্ঠা. ২৩৪

বাহ্যিক কোনও ধর্মীয় রীতি বা ব্রত নেই যা একজন বুদ্ধমতাবলম্বীকে সম্পাদন করতে হয়। বুদ্ধমতবাদ জীবনের একটি উপায় এবং যা জরুরি তা হচ্ছে অষ্টাঙ্গিক মহাপথ অনুসরণ। অবশ্যই সকল বুদ্ধমতাবলম্বী দেশসমূহে ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে সহজ ও সুন্দর অনেক অনুষ্ঠান রয়েছে। বিহারে বেদির ওপর বুদ্ধমূর্তি, স্তূপসমূহ বা দাগাবস এবং বোধিবৃক্ষ রয়েছে যেখানে বুদ্ধমতাবলম্বীরা পূজা করে, বাতি জ্বালায়, ধুপবাতি পোড়ায়। এটাকে ঈশ্বরবাদী ধর্মের প্রার্থনার সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়, এটা শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন যিনি পথটি দেখিয়েছিলেন। যদিও অনাবশ্যক, তবুও যারা আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অনগ্রসর তাদের ধর্মীয় আবেগ ও প্রয়োজন মেটাতে এবং ক্রমান্বয়ে পথের দিকে নিয়ে আসতে সাহায্য করতে এই প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতার মূল্য রয়েছে।

যারা মনে করেন যে বুদ্ধমতবাদ শুধু উচ্চ আদর্শ, উচ্চনৈতিকতা ও দার্শনিক ভাবনায় সম্পৃক্ত, এবং তা মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ প্রত্যাখ্যান করে, তারা ভুল। বুদ্ধ মানুষের সুখের প্রতি গভীর মনোযোগী ছিলেন। তাঁর কাছে নৈতিক ও পারমার্থিক নীতির ওপর স্থিত জীবনযাপন ব্যতীত সুখ অসম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন প্রতিকূল পার্থিব ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে এমন জীবনযাপন করা কঠিন। বুদ্ধমতবাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য পার্থিব কল্যাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে বিবেচিত নয়; এটি শুধু এমন একটি সীমা প্রদর্শন করে যেটি উচ্চতর ও মহান অভিপ্রায় প্রকাশক। কিন্তু এটা অপরিহার্য, মানুষের সুখ লাভের উচ্চতর উদ্দেশ্যে অপরিহার্য। তাই বুদ্ধমতবাদ পরমার্থিক সাফল্যের অনুকূল ন্যূনতম কিছু পার্থিব শর্ত স্বীকার করে এমনকী যে সন্ন্যাসী নির্জন স্থানে ধ্যানে মগ্ন তার জন্যও।[৪৮]

জীবনকে বুদ্ধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে গ্রহণ করেননি; তিনি এর সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক দিকসহ সম্পূর্ণটার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। নৈতিক, পারমার্থিক ও দার্শনিক সমস্যার ওপর তাঁর শিক্ষা সুন্দররূপে সুপরিচিত। বিশেষ করে পশ্চিমে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারের ওপর তাঁর শিক্ষা, অল্পই জ্ঞাত। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থজুড়ে এই সমস্ত বিষয়ের ওপর অগণিত আলোচনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চলুন আমরা কিছু উদাহরণ নিই।

দীঘ-নিকায়ের চক্কবত্তিসীহনাদ-সুত্ত (২৬ নম্বর) স্পষ্টভাবে বক্তব্য প্রদান করে যে, চুরি, মিথ্যা কথা, সংঘাত, ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির মতো অনৈতিকতা ও

---

৪৮. মজ্ঝিম-নিকায়াট্ঠকথা, পপঞ্চসূদনি (PTS) পৃষ্ঠা. ২৯০ (বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের, সঙ্ঘসদস্যদের, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা কাম্য নয়, কিন্তু সাঙ্ঘিক সম্পত্তি অনুমোদিত।)

অপরাধসমূহ দারিদ্র্যের (দালিদ্দিয়) কারণ। প্রাচীনকালের রাজাগণ, আজকের সরকারের মতো, শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধ দমনের চেষ্টা করতেন। একই নিকায়ের কূটদন্ত-সুত্ত ব্যাখ্যা করে যে, এটা কতটুকু নিরর্থক এবং অবগত করে যে এই পদ্ধতি কখনই সফল হতে পারে না। তার পরিবর্তে বুদ্ধ পরামর্শ প্রদান করেন যে, অপরাধ নির্মূল করতে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো উচিত : কৃষক এবং চাষিদের বীজ ও অন্যান্য কৃষিসহায়তা প্রদান করা উচিত; বণিক এবং যারা ব্যবসায় সম্পৃক্ত তাদের পুঁজিপ্রদান করা উচিত; যারা কর্মজীবী তাদের পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা উচিত। যখন মানুষ এইরূপে আয়-উপার্জনের সুযোগ পাবে, তারা সন্তুষ্ট হবে, কোনও ভয় বা উদ্‌বিগ্নতা থাকবে না, এবং ফলস্বরূপ দেশ শান্তিপূর্ণ ও অপরাধমুক্ত হবে।[৪৯] এই কারণে, বুদ্ধ গৃহীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা বলেছেন। এর মানে এই নয় যে তিনি আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তির সঙ্গে সম্পদ সঞ্চয় অনুমোদন করেছিলেন যা তাঁর মৌলিক শিক্ষার পরিপন্থি; তিনি জীবিকানির্বাহের প্রতিটি উপায়ই অনুমোদন করেননি। অস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রির মতো ব্যবসা যা জীবিকানির্বাহের জন্য অশুভ তা নিষেধ করেছেন, তা আমরা পূর্বে দেখেছি।

দীঘজানু নামক একজন লোক একবার বুদ্ধের কাছে এসেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'পূজনীয় ভন্তে, আমরা সাধারণ গৃহী মানুষ, স্ত্রী-সন্তানসহ পারিবারিক জীবনযাপন করছি। ভগবান কি আমাদের কিছু শিক্ষা প্রদান করবেন যা আমাদের এই পার্থিব জীবনও পরবর্তী জীবনের সহায়ক হবে?' বুদ্ধ তাকে বলেন, চারটি বিষয় আছে যা একজন মানুষের পার্থিব সুখের ক্ষেত্রে সহায়ক— প্রথম : তিনি যে পেশায় নিয়োজিত তাতে দক্ষ, কর্মক্ষম, আন্তরিক ও উদ্যমী হওয়া উচিত এবং তা যথাযথভাবে জানা উচিত (উট্‌ঠান-সম্পদা); দ্বিতীয় : সৎপথে কপালের ঘাম দিয়ে অর্জিত আয় তাকে রক্ষা করা উচিত (আরক্ষা-সম্পদা) (এর মানে চোরসহ নানান উপদ্রব থেকে সম্পত্তি রক্ষা করা। সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এই সকল ধারণা বিবেচিত হওয়া উচিত।) তৃতীয় : তার ভালো বন্ধু (কল্যাণমিত্ত) থাকা উচিত, যারা বিশ্বস্ত, পণ্ডিত, ধার্মিক, উদার এবং বুদ্ধিমান, যারা তাকে ভুল পথ থেকে দূরে সরিয়ে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করবে; চতুর্থ : তাকে তাঁর আয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে যুক্তিসংগতভাবে, অত্যধিক কমও না অত্যাধিক বেশিও না, ব্যয় করতে হবে, তাঁর মানে অর্থলিপ্সুর মতো সম্পদসঞ্চয় অনুচিত, তাকে অপব্যয়ী হওয়া উচিত নয়—অন্য অর্থে তাকে তার সংগতির ওপর দৃষ্টি রেখেই বাঁচা উচিত (সমাজীবিকতা)।

---

৪৯. *দীঘ-নিকায় ও (কলম্বো, ১৯২৯) পৃষ্ঠা. ১০১*

তারপর বুদ্ধ গৃহী মানুষের পরজীবনের সুখের সহায়ক চারটি ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করেন : (১) সদ্ধা : নৈতিক, পারমার্থিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অপরিহার্যতাসমূহের প্রতি আস্থা ও আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত; (২) সীল : জীবন ধ্বংস করা, ও ক্ষতি করা থেকে, চুরি ও প্রতারণা থেকে, ব্যাভিচার থেকে, মিথ্যাচার থেকে, এবং উত্তেজক পানীয় থেকে বিরত থাকা উচিত,(৩) চাগ :সম্পদের আসক্তি ও তৃষ্ণা ছেড়ে দান, উদারতার অনুশীলন করা উচিত; (৪) পঞ্ঞা : প্রজ্ঞার উৎকর্ষ সাধন করতে হবে যা সম্পূর্ণ দুর্দশার বিলোপের দিকে, নির্বাণ উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়।[৫০]

অনেকসময় বুদ্ধ অর্থ সঞ্চয় ও ব্যয়ের ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা করেছেন, যেমন—উদাহরণস্বরূপ, যখন তিনি যুবক সিগালকে বলেছিলেন তার আয়ের চার ভাগের একভাগ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয়ভার বহন করতে, অর্ধেক অংশ ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে এবং বাকি চার ভাগের একভাগ যেকোনও সংকটের জন্য জমা রাখতে।[৫১]

একবার বুদ্ধ, তাঁর সবচেয়ে অনুরাগী গৃহীশিষ্য, যিনি তাঁর জন্য বিখ্যাত জেতবন বিহার নির্মাণ করেছিলেন, বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডিককে বলেছিলেন যে, একজন গৃহী, যে প্রচলিত পারিবারিক জীবনযাপন করে, তার চার ধরনের সুখ আছে। প্রথম সুখ হচ্ছে ন্যায় ও যথাযথ জীবিকার মধ্য দিয়ে অর্জিত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা পর্যাপ্ত সম্পদ ভোগের সুখ (অত্থি-সুখ); দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিজের জন্য,তার পরিবার ও আত্মীয়বর্গের জন্য সম্পদ মুক্তহস্তে ব্যয় করার সুখ (ভোগ-সুখ); তৃতীয়টি হচ্ছে ঋণ থেকে মুক্ত থাকার সুখ (অনণা-সুখ); চতুর্থটি হচ্ছে ত্রুটিমুক্ত এবং কায়-বাক্য-মনে কোনও অশুভ চিন্তা না করে বিশুদ্ধ জীবনযাপনের সুখ (অনবজ্জ-সুখ)। এখানে এটা অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যে, এর প্রথম তিনটি দিক হচ্ছে অর্থনৈতিক এবং তাই, বুদ্ধ, পরিশেষে, শ্রেষ্ঠীকে মনে করিয়ে দেন যে, অর্থনৈতিক ও পার্থিব সুখ, নির্ভুল ও উন্নত জীবন হতে উদ্ভূত পারমার্থিক সুখের ষোলো ভাগের একভাগ থেকে উৎকৃষ্ট নয়।[৫২]

উপরে প্রদত্ত কিছু উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, বুদ্ধ, মনুষ্যসুখের আবশ্যিকতা হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নতিকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু উন্নতিকে প্রকৃত ও সত্য বলে মেনে নেননি যদি তা শুধু বস্তুগত হয় এবং পারমার্থিকতা ও নৈতিকতার ভিত্তিবর্জিত হয়। বস্তুগত উন্নতির পাশাপাশি বুদ্ধমতবাদ সবসময় সুখী, শান্তিপূর্ণ

---

৫০. অঙ্গুত্তর-নিকায় (কলম্বো,১৯২৯) পৃষ্ঠা. ৭৮৬
৫১. দীঘ-নিকায় III (কলম্বো, ১৯২৯) পৃষ্ঠা. ১১৫
৫২. অঙ্গুত্তর-নিকায় (কলম্বো, ১৯২৯) পৃষ্ঠা. ২৩২-২৩৩

এবং সন্তুষ্ট সমাজের জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে।

রাজনীতি, যুদ্ধ ও শান্তিতে বুদ্ধ ছিলেন পক্ষপাতশূন্য ন্যায়পরায়ণ; বুদ্ধমতবাদ বিশ্বজনীন বার্তা হিসেবে অহিংস ও শান্তির পক্ষাবলম্বন করে এবং শিক্ষা প্রদান করে, এবং যে কোনও ধরনের হিংসা বা জীবন ধ্বংস করা অনুমোদন করে না। বুদ্ধমতানুসারে 'ন্যায়যুদ্ধ' বলে ডাকা যায় এমন কোনও কিছুই নেই– তা শুধু একটি মিথ্যা শব্দরাশি—ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা, সংঘাত ও গণহত্যা সংঘটিত করার এবং তা ন্যায়সংগত প্রমাণের প্রচারকার্যে ব্যবহৃত। কে সিদ্ধান্ত নেন কী ন্যায় আর কী অন্যায়? শক্তিমান ও বিজয়ীরা ন্যায়, এবং বিজিতরা অন্যায়। আমাদের যুদ্ধ সবসময় ন্যায়, তোমাদের যুদ্ধ সবসময় অন্যায়– বুদ্ধমতবাদ এই মনোভাব গ্রহণ করে না।

শুধু অহিংসা ও শান্তির শিক্ষা বুদ্ধ প্রদান করেননি, তিনি এমনকী যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে মধ্যস্থতা করে যুদ্ধ প্রতিহত করেছিলেন, যেমন শাক্য ও কোলিয়দের বিবাদ,—যারা রোহিনীর জল নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। একসময় তাঁর কথা অজাতশত্রুকে বজ্জিদের রাজ্য আক্রমণ থেকে প্রতিহত করেছিল।

বুদ্ধের সময়কালে, আজকের দিনের মতো শাসককূল ছিল, যারা তাদের দেশগুলো অন্যায়ভাবে শাসন করত। মানুষ ছিল নিপীড়িত-অত্যাচারিত-উৎপীড়িত-শোষিত—অত্যধিক কর চাপিয়ে দেওয়া হতো এবং নিষ্ঠুর দণ্ড আরোপ করা হতো। বুদ্ধ এইসব অমানবিকতা দ্বারা গভীরভাবে বিচলিত ছিলেন। ধম্মপদ অট্‌ঠকথা দেখায় যে, তিনি, এই কারণে তাঁর মনোযোগিতা সুশাসনের সঙ্কটের দিকে দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তাঁর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের উচ্চমর্যাদা পাওয়া উচিত। তিনি দেখিয়েছিলেন যখন রাষ্ট্রের মাথাগুলো : রাজা, মন্ত্রীপরিষদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ দুর্নীতিগ্রস্ত ও ন্যায়পরায়ণতাহীন হয় তখন কীভাবে সম্পূর্ণ দেশ দূষিত, অধঃপতিত ও অসুখী হয়। একটা দেশ সুখী-সমৃদ্ধ হতে হলে এর অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ সরকার থাকতে হয়। কীভাবে এই ন্যায়পরায়ণ সরকারের স্বরূপ বোঝা যাবে তা বুদ্ধের শিক্ষা রাজার দশ-কর্তব্য (দশ-রাজ-ধম্ম) হিসেবে জাতকে বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[৫৩]

---

৫৩. জাতক- ১ম খণ্ড, ২৬০, ৩৯৯; ২য় খণ্ড, ৪০০; ৩য় খণ্ড, ২৭৪, ৩২০; ৫ম খণ্ড, ১১৯, ৩৭৮।

অবশ্যই প্রাচীন রাজার (রাজ) জায়গায় আজকের দিনের সরকার বিষয়টি প্রতিস্থাপিত হওয়া উচিত। এই কারণে, রাজার দশটি কর্তব্য, আজকের দিনে যারা রাষ্ট্রের প্রধান, মন্ত্রিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিধানসভা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ প্রভৃতির প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হওয়া উচিত।

রাজার দশ-কর্তব্য- এর প্রথমটি হচ্ছে বদান্যতা, উদারতা, পরহিতৈষিতা (দান)। সম্পদের প্রতি শাসকের আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি থাকা উচিত নয়, কিন্তু তা মানুষের কল্যাণে বিলিয়ে দেওয়া কর্তব্য।

দ্বিতীয় : উচ্চ নৈতিক চরিত্র (সীল)। তার কখনওই জীবন ধ্বংস করা, চুরি, প্রতারণা ও অন্যদের নিপীড়ন করা, ব্যভিচার করা, মিথ্যাচার করা এবং উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করা উচিত নয়। তার মানে, তাকে কমপক্ষে গৃহীদের পাঁচটি নৈতিক শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে।

তৃতীয় : মানুষের মঙ্গলের জন্য তাকে অবশ্যই নিজের আরাম-আয়েশ, নাম-দাম এবং এমনকী নিজের জীবনও মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করে দিতে হবে (পরিচ্চাগ)।

চতুর্থ : সততা ও ন্যায়পরায়ণতা (অজ্জব)। তাকে সকল প্রকার ভয় অথবা কর্তব্যের অবহেলা থেকে মুক্ত হতে হবে। তার উদ্দেশ্যের প্রতি অবশ্যই অকপট হতে হবে এবং তিনি অবশ্যই মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করবেন না।

পঞ্চম : দয়া ও বিনয় (মদ্দব)। তাকে অবশ্যই দয়াপরবশ মেজাজের অধিকারী হতে হবে।

ষষ্ঠ : স্বভাবে সংযমতা (তপ)। তাকে অবশ্যই সাধারণ জীবনযাপন করতে হবে এবং বিলাসবহুল জীবনযাপন তার জন্য অনুচিত। তার অবশ্যই আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে।

সপ্তম : হিংসা, অশুভ ইচ্ছা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্তি (অক্কোধ)। তার কারও প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা অনুচিত।

অষ্টম : অহিংসা (অবিহিংসা)। যার মানে, শুধু কারও ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকা নয়, যুদ্ধ এবং যা কিছু সংঘাতপূর্ণ ও জীবনধ্বংসী তা এড়িয়ে গিয়ে , প্রতিহত করে শান্তি বজায় রাখাও।

নবম : ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা ও ধীশক্তি (খান্তি)। তাকে অবশ্যই মেজাজ না-হারিয়ে কষ্ট, সঙ্কট ও অপমান বহন করতে সক্ষম হতে হবে।

দশম : বিরোধহীনতা, বাধাহীনতা (অবিরোধ)। তাকে জন-আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করা উচিত নয়, মানুষের কল্যাণে সহায়ক কোনও কর্মপ্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করা উচিত নয়। অন্য-অর্থে তাকে জনতার সঙ্গে ঐক্যের মধ্য দিয়ে শাসন করা উচিত।[৫৪]

যদি একটি দেশ এই রকম গুণে বিভূষিত মানুষদের দ্বারা শাসিত হয়, বলাবাহুল্য যে, এই দেশ অবশ্যই সুখী হবে। এটা কোনও কাল্পনিক রামরাজ্য না, কারণ অতীতে ভারতে অশোকের মতো রাজা ছিলেন যিনি এই ধারণাসমূহের ওপর ভিত্তি করে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আজকের বিশ্ব প্রতিনিয়ত ভয়, সন্দেহ ও উদ্‌বিগ্নতার মধ্যে রয়েছে। বিজ্ঞান যে-সকল মারণাস্ত্র উৎপাদন করেছে সেগুলো অকল্পনীয় ধ্বংসযজ্ঞে সক্ষম। এই সমস্ত মারণাস্ত্র বানানোর মাধ্যমে পরাশক্তিগুলো পরস্পর পরস্পরকে ভীতি প্রদর্শন করছে এবং দ্বন্দ্বে আহ্বান করছে, নির্লজ্জের মতো দম্ভোক্তি করছে যে, কে পৃথিবীতে অন্যের চেয়ে কত বেশি ধ্বংস ও দুদর্শার কারণ হতে পারে।

তারা এই পাগলামির পথদিয়ে এমন এক পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে যে, এখন যদি তারা এভাবে আরও একপদক্ষেপ বেশি যায়, পারস্পরিক ধ্বংস সাধনের মধ্যে দিয়ে সমগ্র মানবতার ধ্বংসছাড়া ফলাফল আর কিছুই হবে না।

নিজেদের সৃষ্ট এই ভীতিকর অবস্থা থেকে মানবজাতি বেরিয়ে আসতে চায় এবং যে কোনও ধরনের সমাধান চায়। কিন্তু কেউই বুদ্ধকর্তৃক গৃহীত অহিংসা ও শান্তির, ভালোবাসা ও করুণার, সহিষ্ণুতা ও ধীশক্তির, সত্য ও প্রজ্ঞার, সকল প্রাণীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার, স্বার্থপরতা, ঘৃণা ও সংঘর্ষ হতে মুক্তির আহ্বান গ্রহণ করে না।

বুদ্ধ বলেন; 'শত্রুতা দিয়ে শত্রুতা কখনওই মিটানো যায় না, কিন্তু মিত্রতা দিয়ে মিটানো যায়। এটাই চিরন্তন সত্য।' [৫৫]

'উদারতা দিয়ে ক্রোধকে, সদ্‌গুণ দিয়ে অসততাকে, এবং পরহিতৈষীতা দিয়ে স্বার্থপরতাকে, সত্যবাদীতা দিয়ে মিথ্যাচারকে জয় করতে হয়।'[৫৬]

---

৫৪. এটা মজার বিষয় যে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে পঞ্চনীতি বা পঞ্চ-সীল বৌদ্ধিক নীতির অনুরূপ যা মহান বুদ্ধমতাবলম্বী সম্রাট অশোক খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকে তাঁর সরকারের প্রশাসনে প্রয়োগ করেছিলেন। পঞ্চ-সীল (পাঁচটি নীতি বা গুণ) অভিব্যক্তিটি নিজেই একটি বৌদ্ধিক পরিভাষা।

৫৫. ধম্মপদ, অধ্যায়-১, গাথা-৫।

৫৬. প্রাগুক্ত, অধ্যায়-১৭, গাথা-৩।

মানুষের জন্য কোনও সুখ বা শান্তি থাকতে পারে না, যতদিন না সে প্রতিবেশীকে পরাজিত করে জয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে। তাই বুদ্ধ বলেন, 'যুদ্ধজয় শত্রুর জন্ম দেয়, এবং বিজিত অতিশয় দুঃখে পতিত হয়। যিনি জয় পরাজয় পরিহার করেছেন তিনিই সুখী ও শান্তিপূর্ণ।'[৫৭] 'শুধু একটি জয়ই সুখ ও শান্তি আনে—তা আত্মজয়। কেউ সহস্রাধিক যুদ্ধক্ষেত্র জয় করে ফেলতে পারেন, কিন্তু যিনি কেবল নিজেকে জয় করেন, তিনিই সর্বোত্তম যুদ্ধজয়ী।'[৫৮]

আপনি বলবেন এই সকল কিছুই খুব সুন্দর, মহান ও উচ্চতর, কিন্তু অবাস্তব। একজন আরেকজনকে ঘৃণা করা কি বাস্তবসম্মত? একজন আরেকজনকে হত্যা করা? জঙ্গলের পশুর মতো শাশ্বত ভয় ও সন্দেহে থাকা? এগুলো কি অধিক বাস্তবসম্মত ও স্বস্তিদায়ক? ঘৃণা কি কখনও ঘৃণা দিয়ে জয় হয়েছিল? মন্দ দিয়ে কি কখনও মন্দকে জয় হয়েছিল? কিন্তু অনেক উদাহরণ রয়েছে, অন্ততপক্ষে ব্যক্তিগত সমস্যাগুলোতে শত্রুতাকে ভালোবাসা ও উদারতা দিয়ে প্রশমিত করা হয়েছে এবং মন্দকে সদ্‌গুণ দিয়ে জয় করা হয়েছে। আপনি বলবেন যে ব্যক্তিগত সমস্যায় এটা হয়ত সত্য, বাস্তবসম্মত, কিন্তু কখনওই তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কল্যাণে কাজ করবে না। রাজনৈতিক ও 'জাতীয়', 'আন্তর্জাতিক' বা 'রাষ্ট্রবিষয়সমূহে'র প্রপাগান্ডার ব্যবহারের দ্বারা মানুষ মনস্তাত্ত্বিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত, প্রবঞ্চিত এবং প্রতারিত। রাষ্ট্র বা জাতি কি একক ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু? একটা জাতি বা রাষ্ট্র কিছু করে না, একক ব্যক্তিই করে। ব্যক্তিমানুষ যা ভাবে ও করে তাই রাষ্ট্র ভাবে ও করে। যা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা জাতি বা রাষ্ট্রের প্রতিও প্রযোজ্য। যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে ভালোবাসা ও উদারতা দিয়ে শত্রুতার নিরসন করা যায়, অবশ্যই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এমনকী একজন ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে উদারতা দিয়ে শত্রুতার মোকাবিলা করতে হলে অবশ্যই নৈতিক শক্তি, প্রচণ্ড সাহস, নির্ভীকতা, আস্থা ও আত্মবিশ্বাস থাকতে হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা কি আরও অধিকতর হবে না? যদি 'বাস্তব নয়' দ্বারা আপনি,'সহজ নয়' বোঝান তবে আপনি সঠিক। অবশ্যই তা সহজ নয়। তারপরও তা চেষ্টা করা উচিত। আপনি বলতে পারেন এ চেষ্টা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অবশ্যই তা পরমাণু যুদ্ধের চেষ্টার চাইতে অধিক ঝুঁকির হতে পারে না।

আজকের দিনের জন্য এটা কমপক্ষে সান্ত্বনা ও অনুপ্রেরণার বিষয় যে, একজন ইতিহাসখ্যাত মহান শাসক ছিলেন, যাঁর বিশাল সাম্রাজ্যশাসনে, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় ব্যাপারে এই অহিংসা, শান্তি ও ভালোবাসার শিক্ষা প্রয়োগের সাহস,

---

৫৭. *প্রাগুক্ত, অধ্যায়-১৫, গাথা-৫।*

৫৮. *প্রাগুক্ত, অধ্যায়-৮, গাথা-৪।*

আত্মবিশ্বাস ও অভিপ্রায় ছিল—তিনি অশোক, ভারতের বিশিষ্ট বুদ্ধমতাবলম্বী সম্রাট (খ্রি. পূ. ৩য় শতক), তাঁকে 'দেবগণের প্রিয়' বলে ডাকা হতো। প্রথমে তিনি তাঁর পিতা (বিন্দুসার) এবং দাদুর (চন্দ্রগুপ্ত) পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং ভারতীয় উপমহাদেশ জয় করার আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি কলিঙ্গ আক্রমণ করেন, জয়ী হন এবং তা দখল করে নেন। এই যুদ্ধে বহু মানুষ নিহত, আহত, নির্যাতিত ও বন্দি হয়। কিন্তু পরে যখন তিনি বুদ্ধমতাবলম্বী হন, বুদ্ধের শিক্ষার দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে যান।

তাঁর একটি বিখ্যাত রাজাজ্ঞায়, পাথরে খোদিত, (পাথরের রাজাজ্ঞা-১৩, এখন এটাকে যেভাবে ডাকা হয়), যার মূল কথা আজও পড়া যায়, কলিঙ্গ জয়ের উল্লেখ করে, সম্রাট সর্বসমক্ষে তাঁর অনুতাপ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, সেই হত্যাযজ্ঞের কথা ভাবা তাঁর জন্য কতটুকু বেদনাদায়ক। তিনি জনসমক্ষে ঘোষণা করেছিলেন, কোনও ধরনের জয়ের জন্য তিনি কখনওই তলোয়ার চালাবেন না, কিন্তু তিনি 'সকল জীবন্ত সত্তার প্রতি অহিংসা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, প্রশান্তভাব ও কোমলতার অনুশীলন করার মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জন করতে চান এটা অবশ্যই দেবগণের প্রিয় (অশোক) দ্বারা শ্রেষ্ঠ বিজয়, ধর্মের দ্বারা বিজয় (ধম্মবিজয়)।' তিনি শুধু নিজেকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত্র করেননি, প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন যে, 'আমার পুত্রগণ ও পৌত্রগণ নতুন বিজয়কে মূল্যবান অর্জন হিসেবে ভাববে না,... তারা যেন শুধু সেই বিজয়ের ভাবনায় থাকে যা ধর্ম দিয়ে জয় হয়। এটাই ইহলোক ও পরলোকের জন্য মঙ্গলজনক।'

মানবজাতির ইতিহাসে এটা একমাত্র উদাহরণ যে, ক্ষমতার শীর্ষে থাকা একজন যুদ্ধজয়ী বীর, তাঁর পার্শ্বরাজ্যগুলো বিজয় অব্যাহত রাখার শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ ও সংঘাত ছেড়ে শান্তি ও অহিংসার মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে আজকের পৃথিবীর জন্য শিক্ষা রয়েছে, একটা সাম্রাজ্যের শাসক প্রকাশ্যে নিজেকে যুদ্ধ ও সংঘাত থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং শান্তি ও অহিংসার বাণী আলিঙ্গন করেছিলেন। কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখানো যাবে না যে, অশোকের অহিংস ধর্মের সুযোগ নিয়ে কোনও প্রতিবেশী রাজা তাকে সশস্ত্র আক্রমণ করেছিলেন অথবা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সাম্রাজ্যে কোনও বিপ্লব বা বিদ্রোহ হয়েছিল। অপরপক্ষে, সমগ্র সাম্রাজ্যজুড়ে শান্তি ছিল, এবং তাঁর সাম্রাজ্যের বাইরের দেশগুলো বোধহয় তাঁর হিতকর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল।

বল-সাম্যের মধ্য দিয়ে বা পারমাণবিক প্রকল্প নিরস্ত্র করার হুমকি প্রদানের মধ্য দিয়ে, শান্তি বজায়ের আলোচনা হচ্ছে বোকামি। অস্ত্রের শক্তি শুধু ভয় উৎপন্ন করতে পারে, শান্তি নয়। প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তি ভয়ের মধ্য দিয়ে হতে পারে না।

ভীতির মধ্য দিয়ে শুধু ঘৃণা, অশুভ ইচ্ছা, শত্রুতা সাময়িক চাপা থাকতে পারে। কিন্তু তা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো প্রস্তুত থাকে এবং যেকোনও সময় সহিংস আকার ধারণ করতে পারে। সত্য ও প্রকৃত শান্তি শুধু মেত্তা, মিত্রতা এবং ভয়, সন্দেহ ও বিপদমুক্ত পরিবেশেই অধিকতর শক্তিশালী হতে পারে।

বুদ্ধমতবাদ একটি সমাজ তৈরি করতে চায়, যেখানে কোনও ধরনের শক্তির জন্য ধ্বংসাত্মক সংগ্রাম বর্জিত; যেখানে দুর্বলদের উৎপীড়ন তীব্রভাবে নিন্দিত, যেখানে আত্মজয়ী বীর লক্ষাধিক সমরজয়ী ও বিত্তশালীদের চেয়ে অধিক শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত; যেখানে ঘৃণাকে উদারতা দিয়ে, অসততাকে সদগুণ দিয়ে জয় করা হয়; যেখানে শত্রুতা, ঈর্ষা, অশুভ ইচ্ছা, এবং লোভ মানুষকে আক্রান্ত করে না; যেখানে করুণা কাজের শক্তি জোগায়; যেখানে নিম্নতর প্রাণীসহ, সবাইকে সুন্দরভাবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে দেখা হয়; যেখানে জীবনের শান্তি ও একতা পার্থিব সন্তুষ্টির পৃথবীতে, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্যের দিকে, চূড়ান্ত সত্য নির্বাণ উপলব্ধির দিকে পরিচালিত।

সাহায্য করো! কালাম-সুত্ত, সাহায্য করো!

থাই জনগণসহ পৃথিবীর সকল মানুষ এখন একই অবস্থায় আছেন যে-অবস্থায় ছিলেন বুদ্ধের সময়কার ভারতের কেসাপুত্তার অধিবাসী কালামগণ। কালামদের গ্রাম এমন এক জায়গায় অবস্থিত ছিল যেখানে বিভিন্ন ধর্মগুরুরা প্রায়শই যেতেন। এই গুরুদের প্রত্যেকেই প্রচার করতেন, তার নিজস্ব মতবাদই শুধু সত্য এবং তার পূর্বে ও পরে প্রচারিত সকল তত্ত্বই ভুল। তাই, কোন মতবাদটি তাদের গ্রহণ ও অনুসরণ করা উচিত তা কালামগণ স্থির করতে পারছিলেন না। যখন বুদ্ধ কোনও একসময় তাদের গ্রামে ভ্রমণ করতে গেলেন, কালামরা তাদের সমস্যা তাঁর কাছে উত্থাপন করলেন—কোন ধর্মগুরুকে বিশ্বাস করা যায় তারা জানেন না। এর ফলে বুদ্ধ তাদের যা শিক্ষা দেন তা এখন কালাম-সুত্ত হিসেবে পরিচিত, যা এখানে আমরা পরীক্ষা করব।

আজকালকার দিনে, বিশ্বজুড়ে মানুষ বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নিয়ে অধ্যয়ন করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষাদান করছে। তারপর, আধ্যাত্মিক ব্যাপার নিয়ে , এখানে, থাইল্যান্ডে, অনেক শিক্ষক রয়েছেন, রয়েছে বুদ্ধশিক্ষার অনেক ভাষ্য, এবং এত বেশি ধ্যানকেন্দ্র আছে যে, কেউই জানেন না কোন শিক্ষাটি গ্রহণ করা যায় বা কোন চর্চাটি অনুসরণ করা যায়। এর ফলে এটি বলা যেতে পারে, আমরা আজ একই অবস্থায় পতিত হয়েছি যে-অবস্থায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে কালামগণ পড়েছিলেন।

শুধু যেকোনও একটা মানদণ্ডের সঙ্গে মিলে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে কোনও কিছু গ্রহণ না-করার বা বিশ্বাস না-করার শিক্ষা বুদ্ধ তাদের, এবং আমাদের দিয়ে গেছেন। তিনি এরকম দশটি মানদণ্ডের প্রতি সচেতন থাকার তালিকা দিয়ে গেছেন, যাতে তারা কারও বুদ্ধিবৃত্তিক গোলাম হয়ে ওঠা পরিহার করতে পারেন, এমনকী বুদ্ধের নিজেরও। এই মূলনীতি আমাদের দুর্দশা উৎপাটনে যথাযথ ক্ষমতার অধিকারী

শিক্ষাটি নির্বাচন করতে সক্ষম করে তোলে। কালাম-সুত্তে বুদ্ধের দেওয়া দশটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো।

১. মা অনুস্সবেন

অনেক বছর ধরে চলে আসছে এবং বার বার বলা হয়েছে বলে কোনও কিছুকে সত্য মনে করে বিশ্বাস ও গ্রহণ করবেন না। এই ধরনের অন্ধবিশ্বাস মস্তিষ্কহীন, 'কাঠের গুঁড়ায় ঠাসা মস্তিষ্কের', মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য। ওই রকম ব্যাংককে লোকজন একসময় বিশ্বাস করত যে, 'মা'-বর্ষে জন্ম নেওয়া ব্যক্তিটি দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় পতিত হন। (ছোটো সর্পবর্ষ, বড়ো সর্পবর্ষ, অশ্ববর্ষ এবং মেষবর্ষ—পাঁচ থেকে আট পর্যন্ত প্রাচীন থাই দ্বাদশ-বর্ষচক্রে—সবকিছু 'মা' দিয়ে শুরু হয়।)

২. মা পরম্পরায

শুধু প্রথাগত রীতি হয়ে গেছে বলে, কোনও কিছুকে স্রেফ বিশ্বাস করবেন না। অন্যরা যা করে তা মানুষ অনুকরণ করতে চায় এবং তারপর অন্যের স্বভাব নিজের মধ্যে প্রয়োগ করে খরগোশের গল্পের ন্যায়, যেটি একটা পড়ন্ত আম দেখে ভয় পেয়ে (যেমন মুরগিছানারা আকাশ থেকে পড়ন্ত ছোটো কিছু দেখলে হয়ে যায়) দৌড়ছিল এবং সেটির খুব দ্রুত দৌড় চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীগুলোও তার পেছনে ভীত হয়ে দৌঁড়াতে শুরু করেছিল। পরিণামে, হোঁচট খেয়ে, গড়িয়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়ে তাদের অধিকাংশই শেষ হয়ে গিয়ছিল। যেকোনও বিপস্সনা-অনুশীলন (অন্তর্লোকে) যা স্রেফ অন্যদের অনুকরণ করে, যা শুধু প্রথাকে অনুসরণ করে এবং তা একই ফলাফল নিয়ে আসবে।

৩. মা ইতিকিরয়

কোনও ঘটনা এবং এর খবর, গ্রাম হয়ে দূরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে বলেই, সহজে বিশ্বাস ও গ্রহণ করবেন না। একমাত্র বোকারাই এমন গুজবে সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাই তারা তাদের নিজের বুদ্ধিমত্তা ও বিবেচনাবোধের শক্তিগুলো চর্চা করতে অস্বীকৃতি জানায়।

৪. মা পিটকসম্পদনেন

পিটকে (গ্রন্থ) লিখিত আছে বলেই গ্রহণ ও বিশ্বাস করবেন না। 'পিটক' শব্দটি যদিও সাধারণত বৌদ্ধশাস্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তা দিয়ে যেকোনও মানানসই লিখিত ও খোদিত লেখ্য উপকরণও বোঝানো যেতে পারে। মুখস্থ এবং মৌখিকভাবে চলে আসা শিক্ষার কারণে পিটকে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। পিটক হচ্ছে একধরনের সন্দেহাতীত আপেক্ষিক ব্যাপার যা মনুষ্যসৃষ্ট ও মনুষ্য-নিয়ন্ত্রিত, যা মনুষ্যহস্তেই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে পারে। ফলে আমরা এর প্রত্যেকটি শব্দ এবং তাতে যা পড়লাম তা বিশ্বাস করতে পারি না। আমাদের নিজস্ব

বিবেচনাশক্তির ব্যবহার করে দেখা প্রয়োজন, কীভাবে এই কথাগুলো দুর্দশামুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। বিভিন্ন বৌদ্ধ ধারার পিটকের মধ্যে অমিল রয়েছে, তাই সতর্কতার প্রয়োজন।

৫. মা তক্কহেতু

কেবল যুক্তিসম্মত বিচারের (তক্ক) নিরিখে কোনও কিছু বিশ্বাস করবেন না। যুক্তি স্রেফ জ্ঞানের একটি শাখা মাত্র যা সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করে। তক্ক বা যুক্তি অব্যর্থ নয়। তথ্য ও অনুমিতি যদি সঠিক না হয়, তবে তা ভুলে পর্যবসিত হয়ে যেতে পারে।

৬. মা নযহেতু

নয বা এখন যা 'দর্শন' বলে অভিহিত তার ভিত্তিতে কোনও কিছুকে সঠিক বলে মনে হলেই তা গ্রহণ করবেন না। থাইল্যান্ডে আমরা পাশ্চাত্য philosophy (বা দর্শন) পরিভাষাটি প্রজ্ঞা হিসেবে ভাষান্তর করি। আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা এটা গ্রহণ করতে পারবেন না, কারণ 'নয' একটা দৃষ্টিভঙ্গি বা অনুকূল ধারণা মাত্র; এটা মহত্তম উপলব্ধি নয় যা যথাযথভাবে পঞ্ঞা বা প্রজ্ঞা নির্দেশ করে। নয বা নযয কেবল একটি অবরোহী বিচারপদ্ধতি অনুমিত সত্য বা পূর্ব-ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিচার ভুল করতে পারে যখন পদ্ধতি বা অনুমিত সত্য অযথার্থ হয়।

৭. মা আকারপরিবিতক্কেন

অগভীর চিন্তার ফলস্বরূপ, যেটাকে আমরা আজকালকার দিনে 'পড়সসড়হ ংবহংব' বলে থাকি, যা স্রেফ আকস্মিক বিচার যা একজনের চিন্তার ঝোঁকের ওপর নির্ভরশীল, সেই 'common sense'-এর মতো লাগছে বলেই কোনও কিছু সহজেই বিশ্বাস বা গ্রহণ করবেন না। আমরা এই অভিগমন এতই প্রয়োগ করতে পছন্দ করি যে এটা স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিছু অসতর্ক ও অহংকারী দার্শনিক এই ধরনের 'common sense' এর ওপর বিশাল ব্যাপারেও নির্ভর করেন এবং তারা নিজেদেরকে চালাক বিবেচনা করে থাকেন।

৮. মা দিট্‌ঠিনিজ্ঝানক্‌খন্তিয়

কারও বদ্ধমূল মতামত এবং তত্ত্বের সঙ্গে একমত হলে বা মিলে গেলেই কোনও কিছু গ্রহণ ও বিশ্বাস করবেন না। ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ ভুল হতে পারে এবং আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি অপর্যাপ্ত হতে পারে, এর কোনওটাই আমাদের সত্যের দিকে পরিচালিত করে না। এই অভিগমন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সদৃশ মনে হতে পারে, কিন্তু কখনওই প্রকৃতভাবে বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না, কারণ, এর প্রমাণসমূহ ও নিরীক্ষাগুলো অপর্যাপ্ত।

৯. মা ভব্বরূপতয়

শুধু সম্মান ও সুনাম থাকার জন্য বক্তাকে বিশ্বাসযোগ্য লাগছে বলে কোনও কিছু বিশ্বাস করবেন না। ব্যক্তির বাহ্যিক দৃষ্টিগোচরতা ও ভিতরের প্রকৃত জ্ঞান কখনওই অভিন্ন হতে পারে না। আমরা প্রায়শই দেখি যে, যেসকল বক্তাকে বাহ্যত প্রশংসাযোগ্য মনে হয় তারা ভুল ও হাস্যকর কথা বলছেন। আজকালকার দিনে আমরা অবশ্যই কম্পিউটার সম্পর্কে সচেতন কারণ প্রোগ্রামার যিনি সেগুলোতে ডাটা প্রদান ও পরিচালনা করেন তিনি ভুল তথ্য দিতে পারেন তখন প্রোগ্রামিং ত্রুটি তৈরি হতে পারে, বা সেগুলোর ভুল ব্যবহার হতে পারে। কম্পিউটারকে এত উপাসনা করবেন না যাতে তা কালাম-সুত্তের নীতির বিপরীতে চলে যায়।

১০. মা সমন ন গরু তি

সন্ন্যাসী (অধিক বিস্তৃতভাবে, যেকোনও বক্তাটি) 'আমার শিক্ষক' ভেবে কিছুই সহজে বিশ্বাস করবেন না। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বুদ্ধ শিক্ষা দেন যে, কারওরই অন্যের বুদ্ধিবৃত্তিক দাস হওয়া উচিত নয়, এমনকী বুদ্ধের নিজেরও না। বুদ্ধ এই বিষয়বস্তুর ওপর বহুবার জোর দিয়েছিলেন, শ্রদ্ধেয় সারিপুত্তের মতো শিষ্যগণ ছিলেন যাঁরা এটি অনুশীলনের মধ্য দিয়েই নিশ্চিত করেছিলেন। তাঁরা বুদ্ধের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করতেন না; কার্যকারণের প্রতিফলন এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়ে পরীক্ষার পর তা করতেন। আপনারা নিজেরা দেখুন পৃথিবীতে আর কোনও ধর্মগুরু আছেন কি না যিনি তার শিষ্য ও শ্রোতাদের এই সর্বোচ্চ স্বাধীনতা দিয়েছেন! পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ছাড়া বিশ্বাস করতে আমাদের চাপ প্রয়োগ করে এমন অন্ধবিশ্বাসের স্থান বুদ্ধমতবাদে নেই। এটা বুদ্ধমতবাদের মহত্ত্বর অনন্যসাধারণতা যা এর অনুশীলনকারীদের কারওর বুদ্ধিবৃত্তিক দাস হওয়া থেকে মুক্তি দেয়। আমরা, থাইরা, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পশ্চিমকে অনুসরণ করছি এখন যেভাবে করছি ঠিক দাসের মতো।

বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা

কালাম-সুত্তের দশটি উদাহরণ বুদ্ধিবৃত্তিক নির্ভরশীলতা ও কারও নিজস্ব গোলাম হওয়ার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিরক্ষা, তা হচ্ছে, কাউকে কোনও কিছু শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কারওর নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখে (পরতোঘোস, 'অন্যের শব্দ' বৌদ্ধিক পরিভাষা)। একজন যা কিছুই শুনুক না কেন, তাতে সতর্কভাবে ও প্রণালিবদ্ধভাবে বিবেচনা করা উচিত। যখন ব্যাপারটির প্রত্যেকটি দিক সুস্পষ্টভাবে মঙ্গলজনক হয় এবং তা দুর্দশা-নির্মূলে সক্ষম হয়, তখনই কেউ চূড়ান্তভাবে তা শতভাগ বিশ্বাস করতে পারেন।

কালাম-সুত্তের মূলনীতি সকলের জন্য, সর্বত্র, সকল যুগে এবং সকল বিশ্বে, এমনকী স্বর্গতুল্য পৃথিবীতেও মানানসই ও যথোপযুক্ত। আজকের বিশ্ব অতিবিস্ময়কর যোগাযোগ এবং তথ্যের সহজ ও দ্রুত বিনময়ের বদৌলতে ছোটো হয়ে এসেছে। মানুষ এখন পৃথিবীর যেকোনও প্রান্ত থেকে নতুন জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে। তা গ্রহণ করতে গিয়ে তারা জানে না কী বিশ্বাস করা যায়, এবং এই কারণে তাদের অবস্থা ঠিক বুদ্ধের সময়ের কালামদের মতো। বস্তুত কালাম-সুত্ত তাদের আশ্রয় হতে পারে। অনুগ্রহ করে এর প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিন এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তা ধারণ করুন। এটা সৌভাগ্য হিসেবে বিবেচনা করুন যে, বুদ্ধ এই সুত্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন। এটা সমস্ত জগতের জন্য একটি উপহার। শুধু যারা অতি বোকা তারাই বুদ্ধের এই শিক্ষা থেকে সুফল গ্রহণ করতে অক্ষম।

সকল বয়সের মানুষের কালাম-সুত্তের অনুশীলন জরুরি। এমনকী বাচ্চারাও অজ্ঞানতার (অবিজ্জা) সন্তান না হয়ে জ্ঞানের (বোধি) সন্তান হওয়ার জন্য, এর মূলনীতি প্রয়োগ করতে পারে। পিতামাতার তাদের সন্তানদের এমনভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে কীভাবে উপদেশ ও নির্দেশনা বুঝতে হয়, কীভাবে যুক্তিপাত করতে হয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং সর্বোপরি যে ফলাফল দাবি করা হয়েছে তা সত্যিই সেরকম হবে কি না তা দেখতে হয়। যখনই নিজেদের সন্তানদের কিছু শিক্ষা দেন বা কথা বলেন না কেন , পিতামাতার উচিত তাদেরকে সাহায্য করা, যাতে তাদেরকে যা করতে বলা হচ্ছে, তা প্রকৃতভাবে বুঝতে পারে এবং সেগুলোতে তাদের নিজেদের মঙ্গল দেখতে পায়। উদাহরণস্বরূপ, যখন মাদক গ্রহণ না-করতে বলা হয়, সন্তানের তা স্রেফ ভয় পেয়ে মেনে নেওয়া উচিত না, কিন্তু মাদক গ্রহণের প্রকৃত ফলাফল কী তা বুঝে মেনে নেওয়া উচিত, এবং এর ফলে নিজ থেকেই সকল নেশাদ্রব্য থেকে বিরত থাকার পথ খুলে যায়।

কালাম-সুত্তের দশটি উদাহরণের কোনও একটিও বোঝায় না যে, বাচ্চাদের কখনওই কারওর কথা শোনা বা বিশ্বাস করা উচিত নয়। সেগুলো সহজেই বোঝায় যে, বাচ্চাসহ আমাদের বাকি সকলেরই সতর্কতার সঙ্গে কোনও কিছু শোনা এবং নিজেদের জন্য এ-বিশ্বাসের যথার্থতা ও শুভ কার্যকারীতা উপলব্ধির পরই শুধু তা সত্য হিসেবে বিশ্বাস করা এবং তারপর তা সঠিকভাবে প্রতিপালন করা কর্তব্য। যখন একজন শিক্ষক কোনও কিছু শিক্ষা দেন, বাচ্চাদের বুঝতে সাহায্য করেন যে, তার শিক্ষাটির পেছনে যুক্তিপাত রয়েছে যা তাদের একগুঁয়ে বানাবে না। একজন একগুঁয়ের ক্ষেত্রে, একটা আলতু বেত্রাঘাত করে পুনরায় বিষয়টি ভাবতে বলেন। বাচ্চারা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কালাম-সুত্ত বিস্তৃতভাবে বুঝবে ও মূল্যায়ন করবে। যদি আমরা বাচ্চাদের এই মানে প্রশিক্ষিত করে তুলি,

তারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, দশ উদাহরণের সব কটি শিক্ষায় সুদক্ষ হয়ে উঠবে।

আজকের বিজ্ঞান-জগৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে থেকে কালাম-সুত্তের দশটি শিক্ষা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। বিজ্ঞানের মূলনীতির সঙ্গে কালাম-সুত্তের সামান্যতম সাংঘর্ষিকতা নেই। এমনকী, অষ্টম শিক্ষাটি, যেটির বক্তব্য হচ্ছে কারওর পূর্ব-অনুমিত তত্ত্বের সঙ্গে কোনও কিছু সংগতিপূর্ণ মনে হলেই তা গ্রহণ অনুচিত, তা বিজ্ঞানের মূলনীতির সঙ্গে কোনও সংঘর্ষ করে না। প্রকৃত বিজ্ঞানীরা কোনও কিছুকে সত্য বলে মেনে নিতে পরীক্ষামূলক প্রমাণকে তাদের বিচারের মূল মাপকাঠি হিসেবে জোর দেন—ব্যক্তিগত মতামত, ধারণা, বিশ্বাস এবং তত্ত্বসমূহকে নয়। কালাম-সুত্তের এমন উচ্চতর মানের জন্য, বুদ্ধমতবাদ প্রকৃত বিজ্ঞানীদের প্রত্যাশা ও প্রয়োজনের সন্তুষ্টি প্রদান করবে।

যদি কেউ কালাম-সুত্তের মূলনীতি অনুসরণ করেন, তবে তিনি স্বাধীন জ্ঞান ও যৌক্তিকতার সন্ধান পাবেন যা দিয়ে অর্থ অনুধাবন করা যায় এবং প্রথমবারের মতো শোনা বা পড়া ধারণা ও প্রতিজ্ঞাসমূহ বুঝতে পারা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ শুনতে পান লোভ-দ্বেষ-মোহ বিপজ্জনক ও মন্দ, তিনি দ্রুত ও তৎক্ষণাৎ তা উপলব্ধি করতে পারেন, কারণ তিনি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসব বিষয় কীরকম তা জানেন। তিনি বক্তাকে নয় বরং নিজেকে বিশ্বাস করেন। অনুশীলনের পথটি অন্য সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই। বক্তব্য যদি পূর্বে কখনও না-দেখা, না-বোঝা কোনও কিছুর বিষয়ে হয়, প্রথমে তাকে তা বুঝতে পারার বা জানতে পারার চেষ্টা করতে হবে। তারপর তিনি বিবেচনা করতে পারবেন নতুন পাওয়া শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ করা যায় কি না। তার একবার সময় নেওয়া উচিত, এমনকী যদি এর মানে হয় খুঁজে বের করার পূর্বেই তিনি মারা যাচ্ছেন। এভাবেই কালাম-সুত্ত তাকে অন্য যেকোনও জনের বুদ্ধিবৃত্তিক দাস হওয়া থেকে রক্ষা করে, এমনকী অতিসুক্ষ্ম ও তথাকথিত 'অলৌকিকতা'র ক্ষেত্র থেকেও।

একটি নতুন ওষুধ বের হলে এবং সব জায়গায় বিজ্ঞাপিত হলে সব সময় সমস্যার উদয় হয়। বিজ্ঞাপনের ওপর বিশ্বাস করে তা পরীক্ষা করতে আমাদের কি তাতে গিনিপিগ হিসেবে নিজেদের সমর্পণ করা উচিত? বা, এতে পূর্ণরূপে নির্ভর করার আগে, প্রথমে, শুধু এর সামান্যটুকুও চেষ্টা করার পর্যাপ্ত কারণ জানা পর্যন্ত , তা বিজ্ঞাপন অনুযায়ী সত্যিই ভালো ফল দেয় কি না তা দেখা পর্যন্ত, আমাদের অপেক্ষা করা কি উচিত নয়? যেভাবে আমরা ওষুধের ক্ষেত্রে সাড়া দিই, সেভাবে যথার্থ শরণ হিসেবে কালাম-সুত্তের মূলনীতি অনুসরণ করে আমাদের নতুন শিক্ষা ও বক্তব্যে সাড়া দেওয়া উচিত।

কালাম-সুত্ত কোনও কিছু বিশ্বাসের পূর্বে আমাদের প্রজ্ঞার উন্নতিসাধন চায়। যদি কেউ প্রথমে বিশ্বাসকে নিয়ে আসতে চান, তাহলে তা সেই বিশ্বাসটি হোক, যার শুরু প্রজ্ঞা দিয়ে, অজ্ঞানতা থেকে জন্ম নেওয়া অন্ধবিশ্বাস দিয়ে নয়। অষ্টাঙ্গিক মহাপথের (অরিয় অট্ঠাঙ্গিক মগ্‌গ) মূলনীতিতে একই সত্য বিদ্যমান : প্রজ্ঞা বা সঠিক উপলব্ধিকে (সম্মা দিট্‌ঠি) সূচনাবিন্দু হিসেবে নিন, তাহলে পরে সেই প্রজ্ঞা বা সঠিক উপলব্ধি থেকে বিশ্বাস জন্ম নেবে। এটাই একমাত্র সহজ আশ্রয়। কোনও কিছু শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধভাবে বিশ্বাস, অথবা ভয়, উৎকোচ, বা পছন্দ করার কারণে বিশ্বাস করতে বাধ্য হওয়া উচিত নয়। বিজ্ঞাপন আর রটনার শক্তিদ্বারা আজকের পৃথিবী এতই আচ্ছন্ন যে অধিকাংশ মানুষ এর দাস হয়ে উঠেছে। ওগুলো যা খাওয়ার দরকার নেই, যা রাখার দরকার নেই, এমনকী যা ব্যবহারেও লাগে না, সে সকল দ্রব্য মানুষকে দিয়ে বিনা ভাবনায় ক্রয় করাতে পারছে। এটা এতই স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, এর থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য সম্পূর্ণরূপে কালাম-সুত্তের মূলনীতি অবশ্যই আমাদের এই সময়ের সকল মনুষ্য-বন্ধুদের কাছে নিবেদন করতে হবে। সাধারণ বিজ্ঞাপন, বা পালিতে যাকে 'পরতঘোস' বলা হয় তার চেয়ে রটনা অধিক বেশি ক্ষতিকর। এমনকী এই সাধারণ বিজ্ঞাপন বা 'পরতঘোস' এর ক্ষেত্রে, আমাদের অবশ্যই কালাম-সুত্তের মূলনীতিকে আশ্রয় করতে হবে, যাতে উদ্দেশ্যপূর্ণ ধারণা হতে উদ্ভূত রটনা অসাড় বলে প্রতীয়মান হয়। অতএব আমরা এও বলতে পারি যে অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিরসনে কালাম-সুত্তে ফলদায়ী।

আমি আপনাদের সকলকে কালাম-সুত্তে পাওয়া এমন মহা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অন্যখানে পাওয়া যায় কি না তা বিবেচনা, অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করতে বলি। যদি কেউ বলেন বুদ্ধমতবাদ হচ্ছে স্বাধীনতার ধর্ম, তবে এই বক্তব্যে বিরোধিতা বা আপত্তি করার কোনও কারণ আছে কি? স্বাধীনতার নেশায় মত্ত পৃথিবী সত্যিই কি কালাম-সুত্তের মূলনীতির সমরূপ স্বাধীনতা জানে বা পায়? কালাম-সুত্ত সম্পর্কে অন্ধ-অজ্ঞানতা ও উদাসীনতা কি এই ধরনের স্বাধীনতার অভাব সৃষ্টি করে না? এমনকী, এটা যে কোনও ব্যাপার বিশ্বাস না-করতে বা না-শুনতে শিক্ষা দেয়— এই দাবি করে কেউ কেউ এই সুত্তকে অবজ্ঞা করেন। কেউ কেউ আরও দাবি করেন যে, বুদ্ধ শুধু সেই সময়ের কালামদের জন্য এই সুত্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন। আজকের দিনে মানুষ যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে দাস হয়ে উঠেছে, বুদ্ধের সময়কার কালামদের চেয়েও যে অনেক বেশি স্বাধীনতা হারিয়েছে, তা কেন আমরা আমাদের চোখ খুলে লক্ষ্য করি না ? প্রিয় বন্ধুগণ, স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারিবৃন্দ, আমি আপনাদের কালাম-সুত্তের সারবস্তু ও লক্ষ্য, এবং এই শিক্ষা প্রদানে বুদ্ধের অভিপ্রায় সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে বলছি। তাহলে,

আপনাদের জাগরণের বৌদ্ধিক গুণাবলিসমূহ সংকীর্ণ ও দুর্বলরূপে বিকশিত না-হয়ে বরং বিস্তৃত ও প্রবলরূপে বিকশিত হবে। বোকার মতো কালাম-সুত্তকে ভয় ও বিরাগ পোষণ করবেন না। 'থাই' শব্দটি দিয়ে স্বাধীনতা বোঝায়। কী ধরনের স্বাধীনতা আপনারা আমাদের 'থাই-গুণ' এ নিয়ে আসছেন? অথবা কোন ধরনের 'থাই-গুণ' বা বুদ্ধের শিষ্যদের বৌদ্ধিক 'থাই-গুণ' স্বাধীনতার জন্য নিখুঁত ও সঠিক?

মুক্ত মানসিকতার মধ্য দিয়ে সংঘর্ষ পরিহার

এখন চলুন আমরা কালাম-সুত্তে লুকিয়ে থাকা মঙ্গলসমূহ ও সুবিধাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি। যে-সকল অকুশল ও সংকীর্ণমনা কথা আমাদের সহিংস সংঘর্ষ ও বিরোধের দিকে নিয়ে যায় তা পরিহার করতে সুত্তটি আমাদের সাহায্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সকল পরিবারের জন্য, স্বামী বা স্ত্রীর ক্ষেত্রে, কে সেই হাতিটির (সংসারের) সামনের পা (নেতা), এবং কে পশ্চাতের পা, তা নির্ধারণ করে অপরিবর্তনীয় নীতি জারি করা বোকামি। এ বিষয়টি প্রত্যেক পরিবারের নির্দিষ্ট কিছু অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। কালাম-সুত্তের মূলনীতি ও নির্দিষ্ট আপেক্ষিকতার সূত্র (ইদপ্পচ্চয়ত) অনুসারে, আমরা শুধু প্রত্যেক পরিবারের পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে পরিবারের সদস্যদের যথাযথ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। দয়া করে একতরফা কথা বলবেন না এবং প্রাকৃতিক বিধান ভাঙবেন না।

গর্ভপাতের ক্ষেত্রে, তা সঠিক না ভুল, কোন ক্ষেত্রে তা উপযোগী বা উপযোগী নয়, তার অনুসন্ধানী আবিষ্কার না-করে, মানুষ তাদের মুখমণ্ডল লাল না-হওয়া পর্যন্ত তর্ক করে। যদি যুক্তিপাতের বৌদ্ধিক পথের প্রাকৃতিক মূলনীতি আমরা অনুসরণ করি, তবে প্রতিটি অবস্থাই দেখাবে কখন তা যথাযথ বা যথাযথ নয়। দয়া করে একপাক্ষিক অবস্থানগুলোতে গোঁ ধরা বন্ধ করুন। মাংস খাওয়া বনাম নিরামিষ খাওয়ার ক্ষেত্রে ঘটনাটি একই। প্রত্যেক পক্ষই একগুঁয়ের মতো এর চূড়ান্ত অবস্থান ঠিক রেখে যুক্তি দেখায়। এই ধরনের লোকেরা খাদ্যের ক্ষেত্রে হয় মাংস না-হয় শাকসবজি প্রতি আসক্ত। বুদ্ধমতাবলম্বীদের জন্য কোনও মাংস অথবা শাকসবজি নেই; আছে শুধু প্রাকৃতিক উপাদান। খাদ্য-খাদক সকলেই প্রাকৃতিক উপাদান মাত্র। কোন অবস্থায় মাংস খাওয়া উচিত এবং কোন পারিপার্শ্বিকতায় উচিত নয় তা কালাম-সুত্তের মূলনীতি ব্যবহার করে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। এই কারণে, বুদ্ধ কখনওই নির্দিষ্ট করে মাংস অথবা শাকসবজি যেকোনও একটি খেতে, অথবা মাংস বা শাকসবজির যেকোনও একটি না-খেতে বলেননি। দায়িত্বহীনভাবে কথা বলা বুদ্ধমতাবলম্বীদের পন্থা নয়।

গণতন্ত্র সর্বদাই উৎকৃষ্ট বলা কারওরই উচিত নয়। যারা এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দেন, তারা বিবেচনা করেন না যে, স্বার্থপর মানুষের গণতন্ত্র, যিনি নিঃস্বার্থ, ধম্ম বা ন্যায়পরায়ণতা অনুযায়ী জীবনযাপন করেন, সেই মানুষের একনায়কতন্ত্রের চেয়ে খারাপ। স্বার্থপর মানুষের গণতন্ত্র মানে ভীতিকর ও আতঙ্কপূর্ণ রীতিনীতিতে তাদের স্বার্থপরতা চরিতার্থ করতে পারার স্বাধীনতা। ফলে, যে-সমস্ত লোকের মধ্যে স্বার্থপরতার গণতন্ত্র আছে সে সমস্ত লোককে সীমাহীন সমস্যার ক্লান্তি বইতে হয়। গণতন্ত্রই সর্বোচ্চ বা একনায়কতন্ত্রই সর্বোচ্চ বলা থেকে বিরত থাকুন। তার পরিবর্তে, ধম্মের ওপর ভিত্তি করা মূলনীতিটির ওপর আস্থা রাখুন। সমাজ যে-সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা মোকাবিলা করছে, তা অনুযায়ী তাতে যেটি সবচেয়ে বেশি কার্যকরী, সেটিই প্রত্যেক সমাজের নির্বাচন করা উচিত।

প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই এমন একজন হবেন যিনি হবেন নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং কখনওই সরাসরি জনতার দ্বারা নির্বাচিত নন এমন কেউ হবেন না—এটা বলা যেন মূক ও বধিরের সামনে তর্জন-গর্জন করা।[৫৯] সত্যিই, আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে পরিস্থিতি কী হতে পারে, সুস্পষ্ট পারিপার্শ্বিকতাগুলো ও কারণ কী, তারপর নির্দিষ্ট শর্তাবদ্ধতার নীতি অনুযায়ী সঠিকভাবে অনুশীলন করতে হবে। রাজনৈতিক ইস্যুগুলোতে একইভাবে প্রয়োগ করতে হয়। এটা প্রকৃত বৌদ্ধিক পন্থা, এ-নীতিটির যথোপযুক্ততার জন্য বুদ্ধমতবাদ গণতন্ত্র উন্মোচিত করে ধম্মীয় সমাজতন্ত্র (Dhammic socialism) রূপে। অতএব, সংসদ সদস্যদের নির্বাচন, সরকার-প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক পদ্ধতির কাঠামো নির্মাণ, এবং এমনকী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সবখানে কালাম-সুত্তের মূলনীতি দিয়ে পরিচালিত হওয়া উচিত। অনুগ্রহ করে, প্রত্যেকটি উদাহরণ বিবেচনা করুন এবং তাতে আপনি এই সুত্তের মূলনীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেন।

যেকোনও সময়ের চেয়ে আধুনিক বিশ্বের পরিচালনায় মূলনীতি হিসেবে কালাম-সুত্তের বেশি প্রয়োজন রয়েছে। পৃথিবী মানবিক কলুষতা-দ্বারা ভাগ্যজাল খুব দ্রুত বয়ন করছে। উন্নত যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও যোগাযোগ-পদ্ধতির কারণে তা ছোটো হয়ে আসছে। এবং যথাযথ সচেতনতা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার অভাবের কারণে তা প্রায় আত্মধ্বংসী হয়ে যাচ্ছে। কলুষতার শক্তির অধীন বিশ্ব জড়বাদ, যৌনতা, এবং ভোগবাদের পূজা করছে, কারণ এতে কালাম-সুত্তের মতো মানদণ্ডের অভাব

---

৫৯ . ১৯৯০-এর মধ্য পর্যন্ত, এই ইস্যু ছিল একদিকে গণতন্ত্রকর্মী এবং অপরদিকে সেনাবাহিনী ও রক্ষণশীলদের মধ্যে বিরোধের একটা বিপজ্জনক কেন্দ্রবিন্দু।

রয়েছে। কেউই জানে না এর নীতিগুলো দিয়ে কীভাবে কোন জিনিস নির্বাচন করা যায়। ফলে, পৃথিবী শান্তির জন্য অনুপযুক্ত, প্রতিটি মুহূর্তে অপরাধ ও দুর্নীতিপরায়ণতা বাড়ছে। চলুন আমাদের মানদণ্ড হিসেবে কালাম-সুত্তের ওপর নির্ভর করে এই সমস্যাবলি ও সকল অমঙ্গল উপড়ে ফেলি।

সর্বশেষে, এই সুত্তের নামকরণের কথা বলতে হয়। প্রকৃতপক্ষে যারা এই শিক্ষা শুনেছিলেন, তাদের নাম যুক্ত করে একে ডাকা হয় কালাম-সুত্ত। যে-এলাকায় এ-শিক্ষাটি প্রদান করা হয়েছিল সে এলাকার নাম যুক্ত করে একে ডাকা হয় কেসপুত্ত-সুত্ত।[৬০] নাম যাই হোক, সারমর্ম ও অর্থ একই থাকে। গত শতকের শুরুর দিকে 'ধম্মসম্পত্তি' নামক সিরিজের মধ্য দিয়ে ত্রিপিটক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।[৬১] তারপর এই সুত্ত কালাম-সুত্ত নামে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। অতএব, চলুন আমরা ফুসফুসের উপরিভাগে গর্জে উঠি, 'সাহায্য করো! কালাম-সুত্ত, সাহায্য করো!'

উপসংহারে, কালাম-সুত্ত কখনওই আমাদের কোনও কিছু বিশ্বাস করতে নিষেধ করে না; তা আমাদের শুধু মিনতি জানায় স্বাধীন বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা দিয়ে কোনও কিছু বিশ্বাস করার জন্য। তা কখনওই আমাদের কোনকিছু শুনতে নিষেধ করে না; তা আমাদের স্রেফ বলে বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা ছাড়া কোনও কিছু শুনলে দাসত্ব বরণ করতে হয়। অধিকন্তু, তা আমাদের খুব সূক্ষ্ম ও স্পষ্টভাবে চিন্তা, বিবেচনা, অনুসন্ধান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও সক্ষম করে, যাতে আমরা পাহাড়তুল্য আবর্জনার স্তূপ থেকে স্বর্ণদানা খুঁজে বের করতে পারি।

অনুগ্রহ করে আসো, কালাম-সুত্ত! আসো বর্তমান বিশ্বে, সকল বুদ্ধামতাবলম্বীর, সকল মানবসন্তানের হৃদয়-মনে, তোমাকে অধিষ্ঠিত করো।

মোক্ষবলরাম
৬ এপ্রিল, ১৯৮৮

---

৬০ . ত্রিপিটকের বিভিন্ন সংস্করণে এই সুত্তের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে।

৬১ . শ্রদ্ধেয় ফ্রা মহাসমনাচাও ক্রমফ্রায়া বচিরায়া ন্যানারোরোত ,সর্বোচ্চ ধর্মগুরু, যিনি থাইল্যান্ডে বুদ্ধমতবাদের মূলপাঠগুলো এবং শিক্ষা আধুনিকীকরণ করেন ।

ভীমরাও রামজি আম্বেদকর

অহিংসা
বিভিন্ন পন্থায় বিশ্লেষিত ও অনুসৃত

অহিংসা বা প্রাণীহত্যা না-করা বুদ্ধশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তা ওতপ্রোতভাবে করুণা ও মৈত্রির সঙ্গে সংযুক্ত। প্রশ্ন উঠেছে যে তাঁর অহিংসা চূড়ান্ত বাধ্যবাধক না শুধু আপেক্ষিক ছিল। এটা কি শুধুই মূলনীতি (principle) ছিল ? নাকি নিয়ম (rule) ছিল? যারা বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করেন তাদের জন্য অহিংসাকে চূড়ান্ত বাধ্যবাধকতা হিসেবে মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তারা বলেন যে অহিংসার এমন ব্যাখ্যা মন্দের জন্য ভালোকে উৎসর্গ, পাপের জন্য পুণ্যকে উৎসর্গ প্রকাশ করে। এই প্রশ্ন সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত। অহিংসার এ বিষয়টির চেয়ে বড় কোনও ভ্রান্তিকর বিষয় নেই। যেসব দেশে বুদ্ধমতবাদ প্রচলিত তারা কীভাবে অহিংসা গ্রহণ করেছে ও অনুশীলন করছে? এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির অবশ্যই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জরুরি। লঙ্কান ভিক্ষুগণ বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং লঙ্কার জনতাকেও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আহ্বান করেন। অন্যদিকে বর্মী ভিক্ষুগণ বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অস্বীকার করেন এবং বার্মার জনতাকেও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আহবান করেন না। বর্মী জনতা ডিম খান, কিন্তু মাছ খান না। এই হচ্ছে অহিংসা বোঝা ও অনুসরণ করার স্বরূপ। সম্প্রতি জার্মান বুদ্ধিস্ট ইউনিয়ন একটি নিয়মাবলি পাস করেছেন যেখানে তারা পঞ্চশীলের প্রথমটি, যেটি অহিংসা বিষয়ক, বাদ দিয়ে বাকি সব গ্রহণ করেছেন। এই হচ্ছে অহিংস মতবাদের অবস্থান।

অহিংসার প্রকৃত অর্থ

অহিংসা বলতে কী বোঝায়? বুদ্ধ কোথাও অহিংসার কোনও ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। প্রকৃতপক্ষে কদাচিৎ যদি মোটের ওপর তাঁর কাছে নির্দিষ্ট বিষয় উত্থাপন করা হতো তবে তিনি তা ব্যাখ্যা করতেন। সুতরাং আনুষাঙ্গিক প্রমাণাদি থেকে আপনাকে তাঁর অভিপ্রায় বের করতে হবে। বিষয়টির ওপর প্রথম পারিপার্শ্বিক

প্রমাণ হচ্ছে বুদ্ধের মাংস খাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি ছিল না, যদি তা তাঁকে ভিক্ষান্ন হিসেবে দান করা হতো। ভিক্ষু তার উদ্দেশে দেওয়া মাংস খেতে পারেন শর্ত হচ্ছে তিনি এই হত্যার সঙ্গে শরিক হতে পারবেন না। বুদ্ধ দেবদত্তের বিরোধিতা রোধ করেছিলেন, যে-দেবদত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন ভিক্ষায় প্রাপ্ত মাংস খাওয়া থেকে সন্ন্যাসীদের বিরত করতে। পরবর্তী প্রমাণটি হচ্ছে তিনি যজ্ঞে প্রাণী উৎসর্গ তথা বলি দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি নিজে কথা বলে গেছেন। 'অহিংসা পরম ধর্ম' একটি চরম মতবাদ। এটি একটি জৈন মতবাদ। এটি বৌদ্ধ মতবাদ নয়। আরেকটি উদাহরণ আছে যেটি প্রায় সরাসরি অহিংসার ব্যাখ্যা প্রদান করে। তিনি বলেছিলেন—'সবাইকে ভালোবাসো যাতে তোমার কাউকেই হত্যা করতে ইচ্ছে না হয়।' অহিংসার মূলনীতি প্রকাশে এটা একটি ইতিবাচক পন্থা। এ থেকে বোঝা যায় যে, অহিংসার মতবাদ বলে না যে প্রাণীহত্যা কোরো না, বলে সবাইকে ভালোবাসো। এই বক্তব্যের আলোকে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে অহিংসা বলতে বুদ্ধ কী বুঝিয়েছিলেন। এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে, বুদ্ধ প্রাণীহত্যার ইচ্ছা ও প্রাণীহত্যার আবশ্যিকতার মধ্যে পার্থক্যটি বোঝাতে চেয়েছিলেন। যেখানে প্রাণীহত্যার আবশ্যিকতা রয়েছে সেখানে তিনি তা নিষেধ করেননি। যেখানে হত্যার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু নেই সেখানেই তিনি প্রাণীহত্যা নিষেধ করেছেন। এভাবে বুঝলে বৌদ্ধ অহিংসার মতবাদে কোনও বিভ্রান্তি থাকে না। এটা যথাযথ যুক্তিনির্ভর বা নৈতিক মতবাদ যা প্রত্যেকের অবশ্যই শ্রদ্ধা করতে হবে। কোনও সন্দেহ নেই, তিনি তা প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন যে তার প্রাণীহত্যার প্রয়োজন আছে কি না। সঠিক পথে চলার জন্য একজন নীতিবান লোককে বিশ্বাস করা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ্যবাদে হত্যার ইচ্ছা স্বীকৃত। জৈন মতবাদে কখনওই হত্যা না-করার ইচ্ছা স্বীকৃত। বুদ্ধের অহিংসা সম্পূর্ণ মধ্যপথ অবলম্বন করে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায়, বুদ্ধ মূলনীতি (principle) ও নিয়মের (rule) মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছিলেন। তিনি অহিংসাকে নিয়মের বিষয় করেননি। তিনি এটাকে জীবনের মূলনীতি বা পন্থা হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহে বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন। একটি মূলনীতি আপনাকে কাজ করার স্বাধীনতা প্রদান করে। কিন্তু নিয়ম তা করে না। নিয়ম হয় আপনাকে ডিঙ্গাবে না হয় আপনাকে নিয়ম ডিঙ্গাতে হবে।

ধম্মানন্দা ভিক্ষুণী

বুদ্ধমতবাদে নারী (প্রশ্নোত্তরসমূহ)

প্রশ্ন-১: বুদ্ধের কাছে যখন রানি মহাপজাপতি সঙ্ঘে যোগদানের অনুমতি চেয়েছিলেন, কেন তিনি দ্বিধাবোধ করেছিলেন, আবার পরে অনুমতিও দিয়েছিলেন?

উত্তর: যারা নারী-উপসম্পদা নিয়ে আগ্রহী তাদের জন্য এটি একটি অন্যতম ধাঁধা-তৈরিকারী প্রশ্ন, যা প্রাসঙ্গিক বোধশক্তি দ্বারা সুবিবেচিত উত্তরের দাবি রাখে। যখন বুদ্ধের পিতা রাজা শুদ্ধোদন মারা গেলেন তখন স্ত্রী হিসেবে মহাপজাপতির স্বামীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। গভীরভাবে বুদ্ধের শিক্ষা অনুশীলন অনুসরণ নিয়ে বিবেচনা করার এটাই ছিল তাঁর জন্য উপযুক্ত সময়। কিন্তু যখন তিনি বুদ্ধের কাছে গিয়ে অনুমতি চাইলেন, বুদ্ধ সোজা বলে দিলেন, 'অনুগ্রহপূর্বক এমনটি প্রার্থনা করবেন না'। ত্রিপিটক, যা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উৎস, সঙ্ঘে নারীদের অনুমোদন না-করার কোনও কারণ প্রদান করেনি। অবস্থার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরবর্তীকালে টিকাসমূহে অনেক বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এগুলোও প্রচলিত বিশ্বাসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল যে, বুদ্ধ নারীদের ধর্মীয় জীবনযাপনের অনুমতি প্রদান করেননি। এগুলো ভিত্তিহীন নয়। ভারতীয় সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী ধর্মীয় জীবনযাপন করা নারীদের গতিপথ নয়। মনুধর্ম-শাস্ত্র স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছে নারীর মুক্তি শুধু তার স্বামীকে ভক্তির মধ্য দিয়ে সম্ভব।

কিন্তু মহাপজাপতি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। বুদ্ধ চলে যাওয়ার পর তিনি ৫০০ শাক্যনারী নিয়ে রাজদরবার হতে মুণ্ডিত মস্তকে হলুদ চীবর পরিধান করে পায়ে হেঁটে তাঁকে অনুসরণ করে বৈশালী পৌঁছেছিলেন, যেখানে বুদ্ধ অবস্থান করছিলেন। পুনরায় প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয়ে তারা আরামে পৌঁছার পরও বুদ্ধের সাক্ষাৎপ্রার্থনা করেননি। আনন্দ, বুদ্ধের কাকাতো ভাই এবং ব্যক্তিগত সহকারী, তাঁদেরকে প্রবেশপথে ধূলিধূসরিত, দীর্ণ চীবর ও রক্তাক্ত পায়ে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা অনেকেই ছিলেন দুর্দশাগ্রস্ত এবং হতাশার অশ্রুতে নিমজ্জিত। তিনি তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের অনুরোধ জ্ঞাত হয়ে বুদ্ধের সমীপে গেলে বুদ্ধ

পুনরায় একইভাবে আনন্দকে নিষেধ করেছিলেন, 'আনন্দ, 'অনুগ্রহপূর্বক এমনটি প্রার্থনা করবেন না'। বুদ্ধের মনে সম্ভাব্য বাধাবিঘ্নতা বোঝার প্রয়াসে বিবেচনায় নেওয়ার মতো অনেক কারণ উদিত হয়েছিল। প্রথমত মহাপজাপতি ছিলেন রানি, রাজদরবারের ৫০০ নারীসহ, শুধু আরাম-আয়েশের জীবন সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সন্ন্যাসজীবন যাপনের জন্য বৃক্ষমূলে অথবা গুহায় নিদ্রা যাওয়া তাঁদের জন্য খুবই কষ্টের। তাই করুণাঘন বুদ্ধ চেয়েছিলেন তাঁরা এ চিন্তা বাদ দিয়ে দিক। অধিকন্তু উপসম্পদার জন্য বিশাল সংখ্যক নারীদের গ্রহণ করলে তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুত তাঁদের নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে হতো। বুদ্ধও তাদের জন্য নিজেকে সার্বক্ষণিকভাবে সুগম করতে পারতেন না। বিশালসংখ্যক নারীদের পরিচালনা করতে উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলীসহ সঙ্ঘ প্রস্তুত ছিল না। পরবর্তীকালে যখন নারীরা সঙ্ঘে গৃহীত হয়েছিলেন তখন এই বাস্তবতাটা প্রমাণিত হয়েছিল। যে সমস্ত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর শিক্ষা দিতে পারেন তাদের অবশ্যই শুধু পণ্ডিত হলেই চলে না, ভিক্ষুণীদের আধ্যাত্মিকভাবে উন্নয়ন ঘটাতে যথাযথ আচরণের অধিকারী হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

এমনিতেই বুদ্ধ, উপসম্পদা প্রদান করে পরিবার ভাঙার অভিযোগে, বাইরের লোকদের থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। যখন মহাপজাপতি ৫০০ শাক্যনারী নিয়ে তার কাছে গিয়েছিলেন, সুনিশ্চিতভাবে তাও অনেক বড়ো সমালোচনার কারণ হতো। শাক্যরা বিশেষত অন্য গোত্রের মানুষের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ করত না। ৫০০ শাক্যনারীকে উপসম্পদার অনুমতি দিলে তা অবশ্যই তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় প্রভাব ফেলত। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে এই সকল নারীর স্বামী ইতঃপূর্বে সঙ্ঘে যোগদান করে ফেলেছিলেন। ফলে, এই সকল নারীদের সঙ্ঘে গ্রহণ করলে তাদের পরিবার ভেঙে যেত বলাটা ভিত্তিহীন।

বিষয় হচ্ছে এই সকল নারীর তাঁকে অনুসরণ করে পায়ে হেঁটে বৈশালী আসা, তাদের ধর্মীয় জীবনযাপনের প্রতি বিশুদ্ধ অঙ্গিকারেরই প্রমাণ করেছিল এবং তাদের উপসম্পদা প্রার্থনা যে ক্ষণস্থায়ী আবেগ থেকে উৎপন্ন নয় সে সন্দেহটা দূরীভূত হয়েছিল। আনন্দও বুদ্ধের প্রত্যাখ্যানের কারণ বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। এর কারণ কি নারীরা আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ করে আলোকিত হতে সমর্থ নন? যদি তা হয়, তবে আধ্যাত্মিক পথ শুধু পুরুষের জন্য খোলা। তখন এ ব্যাপারটি বুদ্ধ স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, নারী ও পুরুষ উভয়েরই আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করে আলোকিত হওয়ার সমান সম্ভাবনা রয়েছে।

আমাদেরকে এই বক্তব্যটির দিকে নজর দিতে হবে, ধর্মগুলোর ইতিহাসে প্রথম একজন ধর্মীয় নেতা অকপটে ঘোষণা করেছিলেন নারী ও পুরুষ আধ্যাত্মিক

ভিত্তিতে সমান। পূর্বে হিন্দু মতানুসারে, বেদসমূহ, পবিত্র গ্রন্থসমূহ শুধু পুরুষদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। বুদ্ধমতবাদ গোত্র, জাতি, বর্ণ ও লিঙ্গবৈষম্যের উর্ধ্বে উঠে ঘোষণা করে যে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অর্জন লৈঙ্গিক বাধা বা বৈষম্য অতিক্রম করে ফেলে। এই সেই গুরুত্বপূর্ণ কারণ যার জন্য বুদ্ধ তার সঙ্ঘে নারীদের যোগদানের অনুমতি দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-২: ভিক্ষুণী-উপসম্পদার জন্য কী কী প্রয়োজন?

উত্তর: ভিক্ষুণী-উপসম্পদার জন্য কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুণীর প্রয়োজন। উপসম্পদা-প্রার্থী নারীর ভিক্ষুণীসঙ্ঘকর্তৃক মনোনীত হওয়ার পর একই দিনে কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর কাছে অবশ্যই মনোনীত হতে হয়। পবত্তিনি বা ভিক্ষুণী-আচার্যকে ন্যূনতম ১২ বর্ষাবাসকারী ও ধর্ম-বিনয়ে সুপণ্ডিত এবং উভয় সঙ্ঘকর্তৃক নিয়োজিত হতে হবে।

সঙ্ঘে নারীদের অনুমোদন প্রাপ্তির পর, নারীদের কাছে সঙ্ঘে যোগদান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, ফলে আবাসন-ব্যবস্থার সঙ্কট দেখা দেয়। প্রত্যেক পবত্তিনি, তখন, প্রতি এক বছর পরপর শুধু উপসম্পদা প্রদান করার জন্য অনুমোদিত ছিলেন। ভিক্ষুণী-আচার্যকে তাঁর তত্ত্বাবধানে ভিক্ষুণীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হয়, তারা যদি অসুস্থ হয়ে পরেন তাদের সেবাযত্নও করতে হয়।

ভিক্ষুদের জন্য তিন ধরনের উপসম্পদা রয়েছে। প্রথম 'এহি ভিক্খু' উপসম্পদা, বুদ্ধকর্তৃক কোনও ধরনের আনুষ্ঠানিক রীতি ছাড়া শুরুর দিকে সরাসরি প্রদত্ত উপসম্পদা। বুদ্ধ শুধু 'ভিক্ষু হয়ে যাও' বলে অনুমোদন দিতেন, যা পূর্ণ উপসম্পদা বলে বিবেচিত ছিল।

তারপর এলো ত্রিরত্ন গ্রহণের মধ্য দিয়ে উপসম্পদা, যথা বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ। এটা প্রথম দিকে আচার্যদের দ্বারা প্রদত্ত এক ধরনের উপসম্পদা যা দিয়ে তাঁরা তাঁদের শিষ্যদের ভিক্ষু হিসেবে গ্রহণ করতেন।

পরে যখন আবেদনকারীদের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল , তখন আরও আনুষ্ঠানিকভাবে উপসম্পদা প্রদান করা হয়েছিল। একে বলা হয় 'নত্তিচতুত্থকম্মবচ', যাতে একজন আচার্য দুইজন প্রশিক্ষক এবং উপসম্পদা প্রত্যক্ষ করতে কমপক্ষে দশজনের ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রয়োজন। এই উপসম্পদা সঙ্ঘদ্বারা প্রদত্ত, এবং এই উপসম্পদাই বর্তমান কালে প্রচলিত।

আরেক ধরনের উপসম্পদা ভিক্ষুণীদের জন্য আরোপিত হয়েছিল। একটা ঘটনা ঘটেছিল, একজন নারী ভিক্ষুণীসঙ্ঘের কাছে উপসম্পদার কার্যক্রম সমাপ্ত

করেছিলেন, কিন্তু উপসম্পদার প্রয়োজনীয় নিয়মানুযায়ী একইদিনে ভিক্ষুসঙ্ঘের কাছে পৌঁছতে পারেননি। কিছু চোর তাকে অপহরণ করার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। তখন বুদ্ধ 'দুতেনসম্পদা' অনুমোদন করেছিলেন—একজন নিযুক্ত দূতের মাধ্যমে উপসম্পদা প্রদান। তা হচ্ছে, হতে যাওয়া ভিক্ষুণীদের পক্ষে ভিক্ষুণীসঙ্ঘকর্তৃক অন্য একজন ভিক্ষুণী নিযুক্ত হয়েছিলেন। এটাও সঠিক উপসম্পদা বলে বিবেচিত।

একজন নারী যিনি উপসম্পদা চান তাকে অবশ্যই কমপক্ষে ২০ বছর পূর্ণ হতে হবে, পিতামাতা বা স্বামীর অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে এবং নিরোগ হতে হবে যাতে পরবর্তীকালে ভিক্ষুণী জীবনযাপন করতে কোনও বাধার সম্মুখীন হতে না হয়। তাকে অবশ্যই শিক্ষামনা হিসেবে দুই বছরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে, এবং প্রয়োজনীয় মৌলিক উপকরণ, যেমন—পাত্র, চীবর প্রভৃতির অধিকারী হতে হবে।

প্রশ্ন-৩ : কেন পুরুষদের উপসম্পদার জন্য শুধু দুইটি স্তর যখন নারীদের উপসম্পদার জন্য তিনটি পর্যায় দিয়ে যেতে হয়?

উত্তর: ৫ টি ভিন্ন ধরনের উপসম্পদা রয়েছে, ২টি পুরুষদের জন্য এবং ৩টি নারীদের জন্য। সামনেরী (নারী শিক্ষানবিশ) ১০টি শিক্ষাসহ নিম্ন-উপসম্পদা (পব্বজ্জা)। পব্বজ্জাপ্রার্থীকে অবশ্যই ধানখেত থেকে গরু তাড়ানোর মতো সক্ষম বয়সি হতে হবে। পরবর্তীকালে এটা ন্যূনতম ৭ বছর নির্ধারিত করা হয়েছিল। বয়স্করাও মাঝে মাঝে শুধু নিম্ন-উপসম্পদা গ্রহণ করেন।

উচ্চ-উপসম্পদার জন্য তিনিই প্রার্থী হতে পারবেন যার পূর্ণ ২০ বছর এবং স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বিদ্যমান। একজন বিবাহিত নারী তার স্বামীর সম্মতি সহকারে ১২ বছর বয়সে নিম্ন-উপসম্পদাপ্রাপ্ত হতে পারেন। শিক্ষামনার জন্য প্রশিক্ষণের কাল পরে প্রবর্তন করা হয়। একজন বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে, একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল যিনি নিজে যে গর্ভবতী তা না-জেনে উপসম্পদা চেয়েছিলেন। তার গর্ভাবস্থার কথা শুধু উপসম্পদার পর গোচরীভূত হয়। এই কারণে একটি নিয়ম প্রচলিত করা হয় যে নারীদের দুই বছরের শিক্ষামনা প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এই সময়ের ভিতর একজন শিক্ষামনাকে ৬ টি অনুধর্ম প্রতিপালন করতে হবে যেগুলো সামনেরীদের ১০ টি শিক্ষাপদের প্রথম ৬ টি। যাই হোক, একজন শিক্ষামনা সামনেরীর চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের প্রশিক্ষণের জন্য বিবেচিত হন যদিও তারা শুধু ৬টি শিক্ষাপদ গ্রহণ করেন। এতে প্রতিভাত হয় যে, একজন শিক্ষামনা প্রকৃতপক্ষে উচ্চ-উপসম্পদা গ্রহণ করার পথে প্রস্তুতিমূলক স্তরের একজন ব্যক্তি; এবং দুই বছর প্রশিক্ষণকালীন যদি তিনি একটি শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করেন তবে তাকে

সবকিছু পুনরায় শুরু করতে হবে। তাকে অবশ্যই একটানা দু বছর প্রশিক্ষণে কোনও শিক্ষাপদ লঙ্ঘন না-করে অবশ্যপূরণীয় শর্ত মিটানো কর্তব্য।

প্রশ্ন-৪ : ভিক্ষুদের থেকে ভিক্ষুণীদের কেন বেশি শিক্ষাপদ পালন করতে হয়?

উত্তর: থেরবাদে ভিক্ষুদের ২২৭ টি শিক্ষাপদ ও ভিক্ষুণীদের ৩১১ টি শিক্ষাপদ পালন করতে হয়। এই পার্থক্যের কারণে প্রায়শই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় যে বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে নারীদের সঙ্ঘে যোগদান চাননি, এবং তাই তিনি শুরুতেই নারীদের আটকিয়ে রাখতে বিধান স্থির করেছিলেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পাতিমোক্ষের মধ্যে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ (থাই শিক্ষার ওপর আন্তর্জাতিক অধিবেশনে উপস্থাপিত, চিয়েংমাই, অক্টোবর ১৪-১৭, ১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে ভিক্ষুদের আটটি পরিচ্ছেদ অনুসরণ করতে হয় যেখানে ভিক্ষুণীদের সাতটি করতে হয়। একটা পরিচ্ছেদ শুধু ভিক্ষুদের জন্য, যাকে বলা হয় 'অনিয়ত'। এই পরিচ্ছেদে দুইটি নিয়ম প্রথম দিককার নেতৃস্থানীয় উপাসিকা বিশাখা কর্তৃক উপস্থাপিত। সেগুলোর একটি ভিক্ষুদের আবদ্ধ জায়গায় একাকী একজন নারীর সঙ্গে থাকা থেকে নিষেধ আরোপ করে এবং অন্যটি ভিক্ষুদের খোলা জায়গায় অন্যদের শ্রবণসীমার বাইরে একাকী একজন নারীর সঙ্গে থাকা থেকে নিষেধ করে। পাতিমোক্ষের প্রথম অনুচ্ছেদ, পারাজিকায়, যা কিছু সবচেয়ে বেশি গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত, কোনও ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী এই সকল বিধির যেকোনওটি লঙ্ঘন করলে তিনি সেই মুহূর্তেই 'পরাজিত।

ভিক্ষুদের জন্য চারটি এবং ভিক্ষুণীদের জন্য আটটি বিধি রয়েছে। যে অতিরিক্ত বিধি এই অনুচ্ছেদে ভিক্ষুণীদের প্রতিপালন করতে হয় তা ভিক্ষুদের বেলায় হয়ত পাওয়া যায়, তবে তা কম গুরুতর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, সঙ্ঘাদিসেসের মধ্যে শ্রেণিবিন্যস্ত। তা লঙ্ঘন করলে একজন ভিক্ষুকে সঙ্ঘ থেকে সাময়িক আত্মনির্বাসন, 'মানত্ত' কালের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এতে সহজেই বোঝা যায় যে বিধি-বিধানের এই শ্রেণিবিন্যাস পরবর্তী সময়ের ভিক্ষুদের হাতে সংগঠিত কাজ। পটিদেসনীয় অংশে ভিক্ষুণীদের জন্য আটটি বিধি রয়েছে। ভিক্ষুদেরও একই বিধি রয়েছে কিন্তু সেগুলো অন্য পরিচ্ছেদ সেখিয়তে শ্রেণিবিন্যস্ত এবং সেখানে এগুলোকে একটি হিসেবে ধরা হয়। ভিক্ষুণীদের জন্য অধিক বিধি থাকার কারণগুলোর মধ্যে এটি একটি অন্যতম কারণ। পচ্চিত্তিয় অংশে ভিক্ষুণীদের জন্য ১৬৬ টি নিয়ম রয়েছে যেখানে ভিক্ষুদের জন্য ৯২ টি। এর মধ্যে উভয় সঙ্ঘের জন্য অভিন্ন ৭০ টি নিয়ম রয়েছে এখানে। তারপর ভিক্ষুদের জন্য স্বতন্ত্র ২২ টি এবং ভিক্ষুণীদের জন্য স্বতন্ত্র ৯৬ টি নিয়ম রয়েছে। ভিক্ষুণীদের ৯৬ টি নিয়মের মধ্যে, এটা লক্ষণীয় যে, অনেক নিয়মই আছে যা উপসম্পদার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়

এবং সেগুলো ভিক্ষুদেরকেও অনুসরণ করতে হয়, কিন্তু তা ভিক্ষুদের জন্য পাতিমোক্ষে গৃহীত হয়নি। এটাও ভিক্ষুণীদের ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে বেশি সংখ্যক পাতিমোক্ষ নিয়ম থাকার অন্যতম কারণ। উল্লিখিত কারণসমূহের জন্য ভিক্ষুণীদের পাতিমোক্ষে, ভিক্ষুদের চেয়ে বেশিসংখ্যক নিয়ম বিধিত রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তাদের একই ধরনের নিয়ম অনুসরণ করতে হয়।

প্রশ্ন-৫ : ত্রিপিটকের পুরুষকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণ কী?

উত্তর : আমি আমার উত্তর শুধু থেরবাদী ধারায় আলোকপাত করছি যা পালিতে শিক্ষাগুলো ধারণ করে আছে। থেরবাদীরা বিশ্বাস করেন যে তাদের শিক্ষা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। আমাদের বোঝা উচিত যে ত্রিপিটক বলে আমরা যা জানি তা বুদ্ধের সময়কালে লিখিত হয়নি। তখনকার সময় ধর্মীয় জ্ঞান অনুশীলন ও হস্তান্তরিত হতো শিক্ষক থেকে বাছাইকৃত শিষ্যদের মধ্যে মুখে মুখে শ্রুতির মাধ্যমে। এই কারণে কোনও ধর্মীয় শিক্ষা তখন লিপিবদ্ধ হয়নি। এমনটি বুদ্ধের শিক্ষার বেলায়ও প্রয়োগ হয়েছিল। ত্রিপিটক যখন প্রথম শ্রীলঙ্কায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল সেটা অবশ্যই ৪৫০ বুদ্ধাব্দ (প্রায় খ্রি.পূ. ৯০) এর পূর্বে নয়।

তা লিপিবদ্ধ হয়েছিল ভিক্ষু লিপিকারদের বোধশক্তি অনুযায়ী। তারা যা লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তা ছিল আত্মপ্রয়োজক, সুতরাং এটা সহজবোধ্য যে কেন ত্রিপিটক পুরুষকেন্দ্রিক। ত্রিপিটক সেই সমস্ত পুরুষ দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছিল যারা ভারতীয় সামাজিক মূল্যবোধে পরিচালিত হতেন। তারা ছিলেন সেই সমস্ত পুরুষ যারা বিনয় দ্বারা পবিত্র জীবনযাপনের প্রত্যাশা করেছিলেন। তাদের বিশুদ্ধিতার পথে সবচেয়ে মুখ্য সমস্যা ছিল বিপরীত লিঙ্গ। এই পুরুষদের দ্বারা সংরক্ষিত বিভিন্ন শিক্ষা তাই নারীদের অশুভ-অপবিত্র হিসেবে (তাদের বাধাসমূহ মূর্তকরণে) নিরোপিত করেছিল। এটা হচ্ছে অশুদ্ধ ত্রুটিপূর্ণ গর্তে পতিত হওয়া থেকে বিরত থাকার ও নিজেদের আত্মরক্ষার্থে দেওয়া প্রয়োজনীয় বেড়া। যখন ত্রিপিটক পড়বেন আপনাকে মনে রাখতে হবে যে এই সীমাবদ্ধতা সামাজিক সীমাবদ্ধতার সার থেকে প্রতিস্থাপিত।

পরমার্থ পর্যায় থেকে দেখতে গেলে যা দৃষ্টিতে আসে তা হলো—বুদ্ধমতবাদ লিঙ্গ-পক্ষপাত থেকে মুক্ত এবং বিশ্বের প্রথম ধর্ম যা নর-নারীর সমান আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা স্বীকার করেছিল। বুদ্ধমতবাদের জন্য এটা একটি বিশেষ উচ্চমর্যাদা প্রদান করে যেটির গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গের সীমারেখা ছাড়া বিশ্বের আধ্যাত্মিক পর্যায় উন্নীতকরণে ভারতবর্ষে যাত্রা শুরু হয়েছিল।

প্রশ্ন-৬ : এটা কি সত্য যে ত্রিপিটক নারীদের বিকাশ রুদ্ধ করে ?

উত্তর : ত্রিপিটক, বুদ্ধমতবাদের ধর্মীয় গ্রন্থের বৃহৎ সংকলন, তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। শিক্ষা লিপিবদ্ধ করে তিনটি ঝুড়িতে রক্ষিত করা হয়েছিল যেগুলোকে বলা হয় পিটক। প্রথম অংশ, বিনয়— ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিধি-নিষেধসমূহ নিয়ে আলোচনা করে। দ্বিতীয় অংশ, সুত্ত— বুদ্ধ ও তাঁর প্রধান শিষ্যদের শিক্ষা নিয়ে আলোকপাত করে। কেউ কেউ যখন সামাজিক প্রেক্ষাপটের ঊর্ধ্বে উঠে মনের উন্নতি নিয়ে কাজ করেন তখনও অন্যদের দেখা যায় ভারতীয় সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা আবৃত। জাতক বা বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনি, ভারতীয় মাটি থেকে বোনা জনপ্রিয় গল্প এরই অংশ। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পর প্রথম সঙ্গায়নে ত্রিপিটকের এই দুই অংশ আবৃত্তি করা হয়েছিল। অভিধর্ম, ত্রিপিটকের তৃতীয় অংশ, চিত্ত ও এর কার্যক্রমের দার্শনিক ব্যাখ্যা যা পরবর্তীকালের ভাষ্যকারদের দ্বারা রচিত। ত্রিপিটকের সকল অংশ প্রথম লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল ৪৫০ বুদ্ধাব্দ (প্রায় খ্রি.পূ.৯০) এর পূর্বে নয় কোনওভাবে।

ত্রিপিটকে উপাদানসমূহ দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : লোকোত্তর ও লোকীয়। লোকোত্তর নামক অংশটি মানসিক মুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে বিশুদ্ধ ধর্ম নিয়ে কাজ করে। তার প্রকৃতি অনুযায়ী, চিত্তের কোনও লিঙ্গবৈষম্য নাই। লোকোত্তর ধর্ম তাই লিঙ্গবৈষম্য ও পক্ষপাত মুক্ত।

লোকীয় নামক পরবর্তী অংশ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত শিক্ষা। সুতরাং, এর মূল্য সামাজিক ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ অংশটিকে আরও দুভাগে ভাগ করা যায়। যার প্রথম ভাগ, ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটে গৃহীত; তাই তা ভারতীয় সামাজিক মূল্যবোধ বহন করেছে এবং চাঙ্গাও রেখেছে। যদি আমরা গঠন-কাঠামো না-বুঝে ত্রিপিটক অধ্যয়ন করি, তাতে পাওয়া উপাদানের বিশাল অংশের জন্য ত্রিপিটককে নারীর বিকাশরোধী বলে মনে হতে পারে।

অন্যদিকে অপর ভাগ সুস্পষ্টভাবে বুদ্ধমতবাদের মনোভাব, ভারতীয় সামাজিক মূল্যবোধ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা, উপস্থাপন করে, যেমন—বর্ণপ্রথা। বুদ্ধ পরিষ্কারভাবে বর্ণপ্রথা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যা ছিল জনগণকে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করার সামাজিক মাপকাঠি। তিনি, এর পরিবর্তে, জোর দিয়েছিলেন যে, কেউ ব্রাহ্মণ পিতামাতার ঘরে জন্ম নিলেই ব্রাহ্মণ হতে পারেন না কিন্তু কুশল কর্ম দ্বারা যে কেউ তা হতে পারেন।

তারপর তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্বচ্ছ করে ঘোষণা করেছিলেন যে, নারী ও পুরুষ আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ করে আলোকিত হওয়ার সমান সম্ভাবনা রাখেন। একজন

নারীর পারমার্থিক অর্জন তার নিজ কর্ম দিয়ে আসে, স্বামীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে নয়। বুদ্ধের সময় নারীরা সঙ্ঘে যোগদান করে ধর্মানুশীলনের সমান সুযোগ পেয়েছিলেন। অনেক বিনয়-বিধান আরোপিত হয়েছিল যাতে ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদের কাছ থেকে যেন কোনও সুবিধা গ্রহণ না করেন, যেমন—ভিক্ষুরা যেন ভিক্ষুণীদেরকে তাদের চীবর, কম্বল প্রভৃতি ধৌত করার আদেশ প্রদান না করেন।

এই অংশে আমরা এমন উপাদান পাই যাতে ত্রিপিটক নারীদের সমর্থন ও উৎসাহ প্রদান করে। আমাদের উচিত এটাকে প্রকৃত বৌদ্ধিক মানস হিসেবে গ্রহণ করা। এটা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধমতবাদের উত্থান বা পতনে বৌদ্ধিক চার পরিষদের এক অংশ হিসেবে দায়-দায়িত্ব ভাগ করে নিতে নারী উন্নয়নের প্রয়াসে সামাজিক পুনর্গঠন।

উপসংহারে, আমরা বলতে পারি যে এটা সত্য যে, ত্রিপিটকে কিছু অনুচ্ছেদ আছে যা নারীর বিকাশরোধী কিন্তু তা প্রকৃত বৌদ্ধিক মানসের পরিচায়ক নয়।

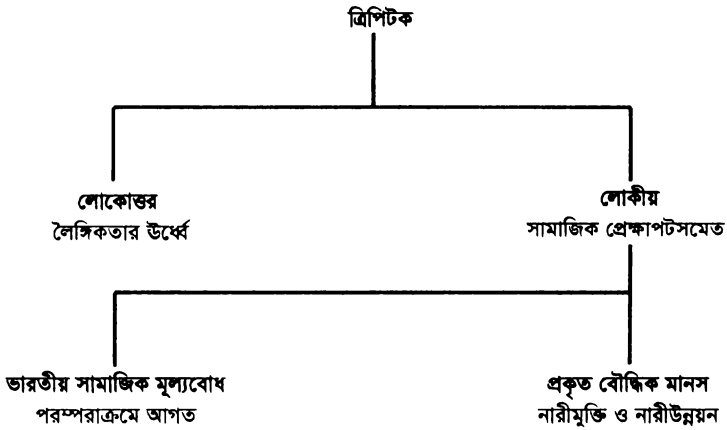

লেখক পরিচিতি

ওয়ালপোলা রাহুল

ওয়ালপোলা রাহুল (১৯০৭-১৯৯৭) এর জন্ম দক্ষিণ শ্রীলঙ্কার ছোটো একটি গ্রাম ওয়ালপোলাতে। তেরো বছর বয়সে তিনি সঙ্ঘভুক্ত হন। সিংহলী, পালি সংস্কৃত পাঠের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বিদ্যালংকার পিরিবেন, সিলন বিশ্ববিদ্যালয় (অধুনা কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষ্ঠা ও সাফল্যের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। তারপর তিনি বিদ্যোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (বর্তমানে জয়বর্ধনপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ভাইস চ্যানসেলর হিসেবে যোগদান করেন। মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরিতে তিনি ছিলেন ভিক্ষুদের মধ্যে একজন পথিকৃৎ ও সক্রিয় কণ্ঠ। ১৯৫৬ সালে সলোমন বন্দরনায়কের নির্বাচনি বিজয়ের পেছনে ভূমিকা পালনকারী বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁর লিখিত *Heritage of the Bhikkhu* গ্রন্থটির বিশেষ ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে তৎকালীন সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক ভিন্নতার কারণে বিদ্যোদয় বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে পশ্চিমে চলে যান। ড. রাহুল হচ্ছেন প্রথম কোনও ভিক্ষু যিনি পাশ্চাত্যে অধ্যাপনার পেশায় নিয়োজিত হন। ইউরোপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেন। জীবনের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কায় ফিরে আসেন।

তিনি সিংহলি, ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় প্রচুর লেখালেখি করেন বুদ্ধমতবাদের উপর। *What The Buddha Taught* তাঁর লেখা একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হচ্ছে : *What The Buddha Taught; History of Buddhism in Ceylon: The Anuradhapura period, 3rd Century BC–10th Century AD; Humour in Pali Literature and Other Essays; The Heritage of the Bhikkhu: A Short History of the Bhikkhu in Educational, Cultural, Social, and Political Life; Heritage of Bhikkhu; Zen and the Taming of the Bull: Towards the Definition of Buddhist Thought: Essays; The Heritage of the Bhikkhu: The Buddhist Tradition of Service* etc.

বুদ্ধদাস ভিক্ষু

বুদ্ধমতবাদ ও থাই লোকবিশ্বাসের নবভাষ্যকার বুদ্ধদাস ভিক্ষু দক্ষিণ থাইল্যান্ডের চইয়া জেলার বান ফুম্রিয়াং-এ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় গুয়াম ফনিচ। তাঁর পিতার নাম সিং ফনিচ ও মায়ের নাম ক্লুয়ান ফনিচ। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি গৃহ জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এরই মধ্যে তিনি সাঙ্ঘিক প্রশিক্ষণের জন্য রাজধানী ব্যাংককে যান। কিন্তু সেখানের কোলাহল, নোংরা-ময়লা এবং বিশেষ করে কলুষিত সঙ্ঘের প্রতি বিরক্ত হয়ে নিজের জন্মস্থানে ফিরে এসে নিজ গ্রামের পাশে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'সোয়ান মোক্ষ'— মানে মুক্তির বাগান। তিনি প্রথাগত আচার-পদ্ধতি ও যে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি যাজকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তা এড়িয়ে সহজভাবে বুদ্ধের শিক্ষা প্রচার করে গেছেন। 'ভালো কাজ করো, মন্দ পরিহার করো, চিত্ত বিশুদ্ধ রাখো', বুদ্ধের এই সহজ শিক্ষার নানামুখী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং ইহজীবনে নির্বাণলাভের শিক্ষা তাঁকে ধীরে ধীরে মানুষকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বিশেষত শহুরে শিক্ষিত শ্রেণি, তরুণ-তরুণীদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। বিভিন্ন জটিল দর্শনশাস্ত্র ব্যখ্যায় তাঁর প্রজ্ঞা ছিল ব্যাপক। তাঁর অসাধারণ ভাবনাশক্তি শ্যামদেশীয় অভ্যুত্থান-১৯৩২ এর নেতা প্রিদি বনোমিয়ং এবং ১৯৬০-৭০ সমাজকর্মী ও শিল্পীদের প্রভাবিত করেছিল। থাইল্যান্ডের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিভিন্ন সময় ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হলো—*The A,B,Cs of Buddhism; Handbook for Mankind; Heart-wood from the Bo Tree; Keys to Natural Truth; Me and Mine: Selected Essays of Bhikkhu Buddhadasa; Mindfulness With Breathing; No Religion; Paticcasamuppada: Practical Dependent Origination;Teaching Dhamma with Pictures* etc.
১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে এই আলোকিত ভিক্ষুর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

ভীমরাও রামজি আম্বেদকর

ডক্টর ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (১৪ এপ্রিল ১৮৯১— ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬) ছিলেন একজন ভারতীয় জ্যুরিস্ট, রাজনৈতিক নেতা, বৌদ্ধ আন্দোলনকারী, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, বাগ্মী, বিশিষ্ট লেখক, অর্থনীতিবিদ, পণ্ডিত, সম্পাদক, রাষ্ট্রবিপ্লবী ও বৌদ্ধ পুনর্জাগরণবাদী। তিনি বাবাসাহেব নামেও পরিচিত ছিলেন। ছিলেন ভারতের সংবিধানের খসড়া কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতিও । তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী এবং ভারতের দলিত আন্দোলনের

অন্যতম পুরোধা, ভারতের সংবিধানের মুখ্য স্থাপক এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী ছিলেন।

ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ভারতের গরিব 'মহর' পরিবারে (তখন অস্পৃশ্য জাতি হিসেবে গণ্য হতো) জন্মগ্রহণ করেন। আম্বেদকর সারাটা জীবন সামাজিক বৈষম্যতার, 'চতুর্বর্ণ পদ্ধতি'-হিন্দু সমাজের চারটি বর্ণ এবং ভারতবর্ষের অস্পৃশ্য প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেগেছেন। তিনি বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হন এবং হাজারও অস্পৃশ্যদের থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম স্ফুলিঙ্গের মতো রূপান্তরিত করে সম্মানিত হয়েছিলেন। আম্বেদকরকে ১৯৯০ সালে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন'—ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে, ভারতের মহাবিদ্যালয় শিক্ষা অর্জনে আম্বেদকর প্রথম 'সমাজচ্যুত ব্যক্তি' হিসেবে পরিণত হয়েছিলেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্স থেকে আইনে ডিগ্রি (বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি) লাভ করার পর, আম্বেদকর বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে সুনাম অর্জন করেন এবং কিছু বছর তিনি আইন চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, পরে তিনি ভারতের অস্পৃশ্যদের সামাজিক অধিকার ও সামাজিক স্বাধীনতার ওপর ওকালতির সময় সমসাময়িক সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। কিছু ভারতীয় বৌদ্ধাবম্বীদের দ্বারা তিনি 'বোধিসত্ত্ব' উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন, যদিও তিনি নিজেকে 'বোধিসত্ত্ব' হিসেবে কখনও দাবি করেননি। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ হলো—*Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development and 11 Other Essays ; Philosophy of Hinduism; India and the Pre-requisites of Communism; Revolution and Counter-revolution; Buddha or Karl Marx ; The Annihilation of Caste; The Buddha and his Dhamma ; Essays on Untouchables and Untouchability,* etc.

ধম্মানন্দা ভিক্ষুণী

ধম্মানন্দা ভিক্ষুণীর গৃহী নাম চাৎসুমন কবিলসিং। ৬ অক্টোবর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে, ভোরমাই কবিলসিং এবং ককিয়াত শাৎসেনার ঘর আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর মা ভোরমাই কবিলসিং (মৃত্যু : ২০০৫ খিস্টাব্দ) যাকে তা তাও ফা জু বলেও ডাকা হতো, তিনি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তাইওয়ানে ধর্মগুপ্ত ধারায় প্রথম আধুনিক থাই ভিক্ষুণী হিসেবে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। ধম্মানন্দা ভিক্ষুণী ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতক, কানাডার ম্যাকমাস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধর্মে স্নাতকোত্তর, এবং ভারতের মগধ বিশ্ববিদ্যালয় হতে

ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর ব্যাংককে থম্মাসট বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ বছরেরও অধিক ধর্ম ও দর্শনবিভাগে অধ্যাপনা করেন। তিনি বুদ্ধমতবাদের বিভিন্ন দিক ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করে সুপরিচিত; ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তিন সন্তানের জননী। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি শ্রীলঙ্কায় আর. সদ্ধা সুমনা ভিক্ষুণী ও টি. ধম্মালোকা ভিক্ষুর কাছে হতে সামনেরী প্রবজ্জা গ্রহণ করেন। তারপর ২০০৩ সালে থেরবাদী ধারায় প্রথম থাই নারী হিসেবে শ্রীলঙ্কায় পূর্ণ ভিক্ষুণী-উপসম্পদা গ্রহণ করেন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি থাইল্যান্ডের প্রথম পবত্তিনী নিযুক্ত হন। বর্তমানে শ্রদ্ধেয় ড. ধম্মানন্দা ভিক্ষুণী থাইল্যান্ডের নাখনপাথোম প্রদেশে মুয়াং জেলার সংধম্মকল্যাণী বিহারে বাস করছেন।

তিনি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিকভাবে বুদ্ধমতাবলম্বী নারীদের কার্যক্রমের ওপর পত্রিকা যশোধরা প্রকাশ করা শুরু করেন—যা প্রায় ৪০ টি দেশে পাওয়া যায়। বুদ্ধমতবাদ ও দারিদ্র, বুদ্ধমতবাদ ও প্রকৃতি, নারীবাদ ও বুদ্ধমতবাদ, পতিতাবৃত্তি (থাইল্যান্ডে), বুদ্ধমতবাদ ও শিক্ষা (গৃহী সন্ন্যাস জীবনে) প্রভৃতি বিষয়ে লেখালেখি করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ হলো— *Women in Buddhism (Questions and Answers)*; *A Comparative Study of Bhikkhuni Patimokkha; A Cry From the Forest; Bhikkhuni Patimokkha of the ix Existing Schools; Buddhism and Nature Conservation; Thai Women in Buddhism; Women and Buddhism*, etc.